মাতৃবাংলা

বঙ্গরত্ন

মাতৃ বাংলা

"বঙ্গরত্ন"

মুক্তবঙ্গ প্রকাশনী
১৭, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা।

স্বত্বঃ লেখক, প্রকাশকঃ মুক্তবঙ্গ প্রকাশনী, ১৭, পল্লবী, মিরপুর,
ঢাকা। মুদ্রণঃ ১৭, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা।
প্রকাশকালঃ মাঘ ১৪০৪/ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮

মূল্যঃ ৬০ টাকা

Matri Bangla by Banga Ratna, Published by Mukto Banga,
Prokashani 17, Pallabi, Mirpur, Dhaka.

Price : Tk. 60 Only

উৎসর্গ

প্রিয়তমা স্ত্রী বুলুকে

মাতৃ বাংলা

প্রথম অধ্যায়

প্রায় তিন হাজার বছর আগে থেকে হিন্দু পুরাণে বঙ্গদেশ নামে যে ভূখন্ডটির উল্লেখ আছে তার সীমানা দ্বারভাঙ্গা থেকে শুরু করে আরাকান এর আকিয়াব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ হলো পশ্চিম থেকে পূর্বদিকের সীমানা। উত্তর-দক্ষিণে এই সীমানা হিমালয়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে বঙ্গোপসাগরের তীর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সেই দীর্ঘকায় বঙ্গদেশের আরাকান প্রদেশকে কেটে বার্মার সাথে জুড়ে দেয়া হয় ১৯৩৭ সালে: যখন বার্মাকে বৃটিশ ভারত থেকে বিচ্ছিন করে একটি পৃথক দেশের মর্যাদা দেয়া হয়। তখন অখন্ড বাংলা-আসামকে ও বৃটিশ ভারত থেকে আলাদা করে একটি পৃথক দেশ ও জাতির মর্যাদা দেয়া যেতো। কিন্তু বৃটিশরা, বাংলা ও বাঙ্গালীর উপর মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। কারণ বাঙ্গালীরা ছিল মেধাবী, মুক্তিকামী এক বিপ্লবী জাতি। তখন যদি বার্মার মত বাংলাকেও একটি পৃথক দেশ ও রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়ে বৃটিশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হতো তাহলে আজ আমরা অবিভক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ ও জাতির ধারক বাহক হতাম। অতীতের আরাকান ছিল মূলত একটি বাংলাভাষী অঞ্চল এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের লালনক্ষেত্র। মাতৃবাংলার খন্ডন ও ক্ষুদ্রায়ন প্রক্রিয়া তখন থেকেই শুরু হয়। যা লক্ষণীয় তা হলো- এর ফলে বাঙালী জাতির মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া বা আলোড়ন হয়নি। একটি নিদ্রাচ্ছন্ন অসচেতন ও অসতর্ক জাতির পক্ষেই এ ধরণের নির্জীবতা ও নির্লিপ্ততা দেখানো সম্ভব। আরাকানের মত আসাম, বিহার, উড়িষ্যা - এই তিনটি অঞ্চলও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। শুধু বৃটিশ আমলেই নয় নবাবী আমল থেকেও বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, আরাকান এক নবাবীর অধীন ছিল। বিহার এবং উড়িষ্যার কয়েকটি জেলা বাংলাভাষায় কথা বলে। তাছাড়া আসামী গদ্যের সাথে বাংলা গদ্যের তেমন কোন তফাৎ নেই বললেই চলে। নেপালের নেওয়ারী প্রদেশের লোকেরাও বাংলায় কথা বলে। ১৯৩৭ সনের দশ বছর পর ভারত বিভাগের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে মাতৃবাংলাকে দ্বিখন্ডিত করা হয়। একটা খন্ড হয় পশ্চিম বাংলা বা হিন্দুস্তানী বাংলা, অপরটি হয় পূর্ব বাংলা বা পাকিস্তানী বাংলা অর্থাৎ ১৯৪৭ সনেই বঙ্গ বিভাগ প্রক্রিয়া শেষ হয়। ঐ বছরই বাংলার দুই মডেল হয় একটি পাকিস্তানী মডেল, অপরটি হিন্দুস্তানী মডেল। জাতি আছে অথচ জাতিসত্ত্বা নেই এই অবস্থাটা দেখা দেয় উভয় বাংলার ক্ষেত্রেই। এর আগে ১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গ ছিল এ প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ যা, লর্ড কার্জনের উদ্যোগে গ্রহণ করা হয়েছিল। মুসলমানদের ভাল করার প্রতিশ্রুতির আড়ালে তা ছিল আসলে ইংরেজদের 'ডিভাইড এন্ড রুল' পলিসির একটা অংশ। যাহোক, শেষ পর্যন্ত ঐ বঙ্গভঙ্গ প্রচেষ্টা সফল হয়নি। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রচন্ড আন্দোলনের ফলে ১৯১১ সনে তা রদ হয়ে যায়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার করার জন্যই রবীন্দ্রনাথ "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" গানটি রচনা করেন এ সময়। এ গানটি খন্ডিত বাংলার প্রতীক নয় বরং

অখন্ড বাংলার প্রতীক। এটা এখন আমাদের জাতীয় সঙ্গীত।

কলিকাতার পার্সী গার্ডেনের একটি জায়গায় রবীন্দ্রনাথ "বঙ্গভবন" এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। যুক্তবাংলার আন্দোলন এর সদর দফতর হিসাবে কবিগুরু "বঙ্গভবন" স্থাপন করার প্রয়াস নেন। যুক্তবাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সাধনার স্মৃতি বহন করে চলেছে বঙ্গভবনের সেই ভিত্তিপ্রস্তর। বঙ্গভবন নামটি আমাদের রাষ্ট্রপতি ভবনের নাম হিসবেও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমাদের জাতীয় পতাকায় কিছু সংখ্যক অদুরদর্শী ব্যক্তি তড়িঘড়ি করে পূর্ববাংলার একটি ম্যাপ বসিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ একমাত্র সাইপ্রাস ছাড়া বিশ্বের আর কোন দেশের জাতীয় পতাকায় ম্যাপ নেই। তুরস্কের সঙ্গে ভূখন্ডগত বিরোধের জন্যই সাইপ্রাস এর পতাকায় মানচিত্র আঁকা হয়েছে। একটি বিশেষ মহল অতি উৎসাহী হয়ে এ কাজটি করেছিলেন। কারণটা সহজেই অনুমান করা যায়। বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে একটি নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা একটি বাস্তবধর্মী ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা থেকে মানচিত্রটি তুলে দেন। অত্যন্ত দূরদর্শী এবং ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ছিল এটা।

আমার মনে পড়ে প্রায় একই সময় পল্টন ময়দানে দাঁড়িয়ে মওলানা ভাসানী পশ্চিমবাংলার বাঙালীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন "আমরা যদি ইসলামাবাদ ছাড়তে পারি তবে আপনারা দিল্লী ছাড়তে পারবেন না কেন ?" হ্যা, এটাই আসলে পশ্চিম বাংলাবাসীর আত্মপরিচয় সন্ধানের দিকনির্দেশক হওয়া উচিত। তারা পরিচয় সংকটে ভুগছেন। বাঙালী না ভারতীয় ? নাকি আধা-বাঙালী, আধা-হিন্দুস্তানী ? তারা কি বঙ্গমাতার সন্তান, না ভারত মাতার ? এ সব প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক ভবিষৎত নিহিত।

যে দ্বারভাঙ্গা এলাকাটি আবহমান কাল ধরে অখন্ড বাংলার পশ্চিম সীমানা হিসেবে পরিচিত তা আসলে ছিল দ্বারবঙ্গ বা বঙ্গের দ্বার। মানুষের মুখে অপভ্রংশ হয়ে দ্বারবঙ্গ কথাটি দ্বারভঙ্গ বা দ্বারভাঙ্গা হয়ে গেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে দ্বারভাঙ্গা হচ্ছে "বেঙ্গল গেট" যেমন আছে "ইন্ডিয়া গেট" বোম্বেতে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে আবহমান বাংলার পশ্চিম সীমানা হচ্ছে দ্বারভাঙ্গা যা - বাংলার শেষ প্রান্তে অবস্থিত। তাছাড়া হিন্দু পুরাণে উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রদেশ, গুজরাট প্রদেশ ইত্যাদির পাশাপাশি লেখা আছে "বঙ্গদেশ", "ব্রহ্মদেশ", "শ্যামদেশ" ইত্যাদি। অর্থ্যাৎ বঙ্গপ্রদেশ কোথাও লেখা নেই। এটাই প্রমাণ করে যে, হাজার হাজার বছর আগে থেকেই বঙ্গ একটি পূর্ণাঙ্গ দেশ ছিল এবং বাঙালীরা ভারতীয় জাতিসত্ত্বার বাইরে আলাদা একটি জাতিসত্ত্বা নিয়ে বিরাজ করেছে - যেমন করেছে ব্রহ্মদেশ (বার্মা) ও শ্যামদেশ (থাইল্যান্ড)। একটা মস্তবড় সত্য হলো - বাঙালীরা প্রাচীনতম জাতিসমূহের একটি। সেই তুলনায় পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ বা হিন্দুস্তানী জাতীয়তাবাদ একেবারেই নতুন, যার বয়স মাত্র পঞ্চাশ বছর অথাৎ ১৯৪৭ সালে এর জন্ম। ভারতীয় সভ্যতা যদিও পুরাতন কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলতে তেমন কিছু ছিল না। কারণ ভারতবর্ষ কখনও এক জাতি

– একদেশ ছিল না। আগেই বলেছি। ১৯৩৭ সনে বার্মাকে ব্রিটিশ ভারত থেকে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন করার সময় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী থেকে আরাকানকে কেটে নিয়ে বার্মার সাথে জুড়ে দেয়া হয়। এটা ছিল ইংরেজ শাসকদের এক চূড়ান্ত খামখেয়ালীপূর্ণ সিদ্ধান্ত। বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনের সাথে আরাকানের কোন স্থল যোগাযোগ নেই। পক্ষান্তরে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের সাথে চমৎকার সড়ক যোগাযোগ রয়েছে আরাকানের রাজধানী আকিয়াব এর সাথে। আরাকান যে মূল বাংলাদেশ ভূখন্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এভাবে পর্যায়ক্রমে ব্রিটিশ শাসকরা বাংলার অখন্ডতাকে নষ্ট করেছে। এর দশ বছর পর ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা পশ্চিমবাংলা দিয়েছে হিন্দুস্তানকে আর পূর্ববাংলা দিয়েছে পাকিস্তানকে। এভাবে মূল বাংলার অস্তিত্বকেই বিলুপ্ত করে দেয়া হয়। এ কাজে ইংরেজ এর চেয়েও ক্ষতিকর ভূমিকা নিয়েছিলেন নেহেরু–গান্ধী জুটি। বাংলার একখন্ড আছে নেপালের নেওয়ারী প্রদেশে– যেখানকার লোকেরা প্রধানতঃ বাংলায় কথা বলে !

বাঙালীদের বঙ্গচেতনা যে খুবই কম তার একটা প্রমাণ হলো অধিকাংশ বাঙালীই জানেন না সংখ্যায় পৃথিবীতে বঙ্গভাষীদের স্থান কোথায় ? চীনা, ইংরেজী – এই দুই এর পরেই বাংলার স্থান। পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম কথিত ভাষা হচ্ছে বঙ্গভাষা। প্রায় ১০০ কোটি লোক চীনা ভাষায়, ৫০ কোটি লোক ইংরেজী ভাষায় এবং প্রায় ২৪ কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে। ১৯ কোটি লোক রুশ ভাষায় এবং মাত্র ১৮ কোটি হিন্দি ভাষায় কথা বলে অর্থাৎ যারা জন্মসূত্রে হিন্দিভাষী। কাজেই দেখা যাচ্ছে হিন্দি ভাষা হচ্ছে পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম কথিত ভাষা, যেখানে বাংলা হলো তৃতীয় বৃহত্তম কথিত ভাষা। সারাবিশ্বে মাত্র ৫(পাঁচ) কোটি লোক উর্দু ভাষায় কথা বলে এবং উর্দু ভাষার অবস্থান হচ্ছে ১৪ নাম্বারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে হিন্দি–উর্দু মিলিয়ে যত লোকে কথা বলে একা বাংলা ভাষাতেই তত লোক কথা বলে। ফরাসী–জার্মান ভাষায় মিলিতভাবে যত লোক কথা বলে একা বাংলা ভাষায় তার চেয়ে বেশী লোকে কথা বলে। ভারতবর্ষ নামক উপমহাদেশে বাংলা ভাষাই সবচেয়ে বড় ভাষা এবং সবচেয়ে উন্নত কালচার।

পশ্চিম বাংলার লোকেরা যে পরিচয় সংকট বা আইডেনটিটি ক্রাইসিসে ভুগছেন সে কথা না বললেও চলে। পশ্চিম বাংলার অধিবাসীরা অসম মিশ্রণের ফলে এ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের মত ব্যাংলো–ইন্ডিয়ান সেজে বসে আছেন। পাকিস্তানী বা হিন্দুস্থানী জাতীয়তার ভিত্তি হচ্ছে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা – ভাষা, বর্ণ, সংস্কৃতি কিংবা জাতিসত্ত্বা নয়। প্রাচীনত্ব ও মৌলিকতার দিক থেকে বাঙালী জাতীয়তাবাদ পাকিস্তানী কিংবা হিন্দুস্তানী জাতীয়তাবাদের তুলনায় শতগুণ বেশী প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী। কেননা এর গোড়াপত্তন হয়েছিল প্রায় ২৩০০ বছর আগে থেকে; আর পাকিস্তানী–হিন্দুস্তানী জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছে মাত্র ৫০ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে। অর্থাৎ উপমহাদেশের এ দু'টি জাতীয়তাবাদ হঠাৎ করে গঁজিয়ে উঠা এক ধরনের নব্য জাতীয়তা যার অনেকটাই বিদেশী শাসকের তৈরী করা এবং স্থানীয় নেতাদের ধর্মবিদ্বেষ ভিত্তিক অপরাজনীতির বিষাক্ত প্রভাবে গড়া।

আমি মনে করি এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করি, ভারত একক কোন দেশ নয় এমনকি উপমহাদেশও নয়– এটা আসলে বৈচিত্রময় বহু জাতির সমাবেশে গড়া একটা মহাদেশ! বিশ্বের সাতটি মহাদেশের নামকরণ এবং ভৌগোলিক বিভাজন করেছিল ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গরা – বিশেষত ইংরেজরা । তারা বিশ্বের আর কোন মহাদেশের অংশবিশেষকে উপমহাদেশ নাম দেয়নি। অতীতে মাত্র এক কোটি লোক এর ভূখন্ড অস্ট্রেলিয়াকে মহাদেশ নাম দেয়া হয়েছে অথচ অতীতে প্রায় চল্লিশ কোটি লোক অধ্যুষিত ভারতবর্ষকে সাব–কন্টিনেন্ট বা উপমহাদেশ নাম দেয়া হয়েছে। অথচ ভারতবর্ষের আকৃতি প্রকৃতির মধ্যে মহাদেশ হবার মত উপাদান অনেক বেশী, অন্তত ইউরোপের চেয়ে অনেক বেশী। প্রতি পাঁচশত মাইলের ব্যবধানে এখানে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ, সংস্কৃতি ও ভাষার অস্তিত্ব রয়েছে। ভারতবাসীরা আসলে বাঙালী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, কাশ্মিরী, মারাঠি, তামিল, তেলেগু, গুজরাটী ইত্যাদি জাতিতে বিভক্ত। দাক্ষিণাত্যের লোকদের কাছে হিন্দি ভাষাও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ অপরিচিত!

সোভিয়েত রাশিয়াকে বাদ দিলে দেখা যাবে ভারতবর্ষ ইউরোপ নামক মাহাদেশটির চেয়েও অনেক বড় এবং অনেক বেশী বৈচিত্র্যময়। তার সভ্যতার কথা নাই বা বললাম – যা ইউরোপ, আমেরিকার চেয়ে অনেক বেশী প্রাচীন। লোক সংখ্যার হিসাবে ভারতবর্ষ অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় প্রায় পঞ্চাশ গুন বড়। অতীতে ভারতবর্ষ কখনও একদেশ একজাতি ছিল না বরং ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও জাতিতে বিভক্ত ছিল। বহিরাগত মুসলমানরা ভারতবর্ষ জয় করার পর শাসনকার্যের সুবিধার জন্য এর একটা একক নাম দেয় – "হিন্দুস্তান।" একই কারণে বহিরাগত ইংরেজরা নাম দেয় – "ইন্ডিয়া।" ভারতবাসীদের নিজদের দেয়া কোন একক নাম নেই ভারতবর্ষের। রবীন্দ্রনাথও একথা লিখেছেন তার "ভাষাপরিচয়" গ্রন্থে। তাহলে একটা বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, ভারত কখনও একরাষ্ট্র ছিল না। – ভবিষ্যতেও হবে না – হতো যদি ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান মেনে নিতো ভারতের তৎকালীন নেতা ও কংগ্রেস সভাপতি পন্ডিত জওহেরলাল নেহেরু। যখন লীগ ও কংগ্রেস সবাই একবাক্যে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান মেনে নিল তখন সকলেই একটা কথা ভেবে আশ্বস্ত হয়েছিলেন যে, ভারতীয় সমস্যার সুন্দরতম সমাধান হতে চলেছে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান বাস্তবায়নের মাধ্যমে। যার ফলশ্রুতিতে বাংলা–আসাম স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের এবং দুর্ভাগ্য বাংলা ও পাঞ্জাবের। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি নেহেরু সবাইকে আবাক করে দিয়ে বোম্বাইতে এক শিশুসুলভ বক্তৃতা দিয়ে মন্ত্রিসভা মিশন এর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে প্রথম প্রতিবন্ধক তা তৈরী করেন এবং মাওলানা আজাদের মত আদর্শবান কংগ্রেসী নেতাদের দীর্ঘদিনের সাধনার ধন ভারত সমস্যা সমাধানের ফর্মূলাকে ভন্ডুল করে দেন। এভাবে তিনি পরোক্ষভাবে ভারত বিভাগ তথা বঙ্গবিভাগকে অনিবার্য করে তুলেন। জনাব নেহেরু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে ঘোষণা দিলেন – কংগ্রেস মন্ত্রী মিশনের কিছুই মানতে রাজি নয়। ১৫ অনুচ্ছেদ এবং ১৯ উপ অনুচ্ছেদও মানতে রাজি নয়।' এর ফলে ভারত ভাগ হয়ে গেল – যার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে বাংলাও ভাগ হয়ে গেল। অথচ গোড়ার দিকে মুসলিম লীগও কংগ্রেস উভয়েই মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ১০ই জুলাই ১৯৪৭ তারিখে জওহেরলাল

বোম্বাইতে এক সম্মেলন ডেকে বললেন, 'কংগ্রেস মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা মানে না। কংগ্রেস ১৫ অনুচ্ছেদ ও ১৯ উপ অনুচ্ছেদও মানে না।'

এ প্রসঙ্গে মাওলানা আজাদ তার বিখ্যাত 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' গ্রন্থে লিখেছেন – " ঐ সময় কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করে জওহেরলালকে সভাপতি বানানো আমার রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল ছিল। আমি কখনও এ ব্যাপারে নিজেকে ক্ষমা করতে পারিনি।" নেহেরুর ঐ বক্তৃতার ফলে মন্ত্রী মিশন প্রস্তাব ব্যর্থ হলো – যার ফলে ভারত দ্বিখন্ডিত হয়ে গেল। এটা এমনই একটা ভুল, যা ছিল 'হিমালয় সম' – গান্ধীজির ভাষায়। এর ফলে বাংলাও দ্বিখন্ডিত হলো। বাংলা–বিভাগ খুবই নাজুক এবং স্পর্শকাতর একটি ঘটনা। কারণ পাঞ্জাবের মত কিংবা ভারতের অন্য যে কোন রাজ্যের মত বাংলা একটি প্রদেশ মাত্র ছিল না। আবহমান কাল ধরে তার পরিচয় বঙ্গদেশ, বঙ্গপ্রদেশ নয়। পাঞ্জাব বিভাগের তুলনায় বঙ্গবিভাগের প্রতিক্রিয়া অনেক সূদূরপ্রসারী! কেননা, পাঞ্জাব প্রদেশ বিভক্ত হয়েছিল (যা কোনদিনই পাঞ্জাব দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল না)। এর জন্য মাওলানা আজাদের ভুল সিদ্ধান্তও ব্যাপকভাবে দায়ী – যদিও ঐ ভুল ছিল অনিচ্ছাকৃত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যার হঠকারিতা ও দুরভিসন্ধিমূলক তৎপরতার ফলে ভারতবর্ষ ও বাংলা দ্বিখন্ডিত হলো বাংলার ইতিহাসে তিনি একজন ধিকৃত ব্যক্তি হিসাবে স্থান পাবেন। আসলে পাকিস্তানের জন্ম যিনি দিয়েছিলেন তিনি মূলত জিন্নাহ নন, নেহেরু। এই সত্য 'আজ আপামর বাঙালীকে বুঝতে হবে – বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার বাঙালীকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ভারতীয় লেখক পিলূ মোদী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশে মন্তব্য করে ছিলেন – "ইউর ফাদার ক্রিয়েটেড ওয়ান পাকিস্তান এন্ড ইউ হ্যাভ ক্রিয়েটেড টু।" কারণ যে বাংলাদেশ জন্ম নিল তা পূর্ব পাকিস্তানেরই নামান্তর মাত্র – সম্পূর্ণ বাংলা নয়। প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ পূর্ণাঙ্গ বাঙালী জাতীয়তাবাদ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে – একথা এখনই বলা যায় না – একথা তখনই বলা যাবে যখন পশ্চিম বাংলা ও ত্রিপুরা মূল বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। এর ভার আগামীদিনের ইতিহাসের উপর থাকবে। বিগত একদশকে দ্বিখন্ডিত জার্মানী, ভিয়েতনাম এবং ইয়েমেন এক হয়েছে – দ্বিখন্ডিত কোরিয়া এক হতে চলেছে অদূর ভবিষ্যতে এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে বলা যায় কোরিয়ান পুনর্মিলনের পর বিশ্বে খন্ডিত জাতি হিসেবে শুধু বাঙ্গালীরা থাকবে – যদি তখানও বাঙালী অর্ধ শতাব্দীর বিচ্ছিন্নতাকে অস্বীকার করে হাজার বছরের ঐক্যের পূর্ণ্যতীর্থে পুনরায় একত্রিত না হয়, – যদি তখনও বাঙালী ঘৃণার বদলে ভালবাসাকে, সাম্প্রদায়িকতার বদলে মানবতাকে বরণ করতে ব্যর্থ হয়।

জওহরলালের স্বরূপ বাঙ্গালীদের কাছে উদঘাটিত। আর যে ব্যক্তিটিকে বাঙ্গালীর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উপাধি দিলের 'মহাত্মা' তিনি কি করে বাংলার ঐক্যের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করলেন তাও জানা দরকার। বাংলা বিভক্তির জন্য গান্ধীও কম দায়ী নন। যে দুইজন

অবাঙ্গালী কংগ্রেস নেতা বাংলা বিভাগের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী তারা জওহরলাল নেহেরু এবং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

১৯৩৭ সনের সাধারণ নির্বাচন এর পর গান্ধী বাংলায় কৃষক প্রজা ও কংগ্রেস মন্ত্রিসভা করতে দিলেন না ; এর ফলে পরোক্ষভাবে তিনি বাংলায় মুসলিমলীগকে শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে ছিলেন আর উনার ভাবশিষ্য নেহেরু কিভাবে কংগ্রেস এর সভাপতি হয়েই মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনা নাকচ করে ভারতবিভক্তি তথা বাংলা বিভক্তির পথ সহজ করে দিয়ে ছিলেন তা আগেই বলেছি। বাংলায় কংগ্রেস এর নেতৃত্বের দায়িত্বে ছিলেন শরৎ বসু। তিনি ছিলেন নেতাজী সুভাষবসুর বড় ভাই। শরৎবসুর মত শেরে বাংলা ফজলুল হক ও ছিলেন শতকরা একশতভাগ বাঙ্গালী। গান্ধী ভাবলেন প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ফজলুল হককে হাত করতে পারবেন না এবং এ কারণেই বাংলায় তিনি কৃষক প্রজা-কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করতে দিলেন না – অর্থাৎ তিনি একরকম ইচ্ছে করেই শেরেবাংলা-কে কংগ্রেস থেকে দূরে ঠেলে দিলেন। ফলে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ এই এক দশকে সমগ্র বাংলায় মুসলিম লীগের বিশাল অগ্রগতি সাধিত হয়। লক্ষ্যনীয় যে, ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে শুধু বাংলাতেই মুসলিম লীগের জয়লাভের ফলে পাকিস্তান দাবী কার্যকর হয়েছিল। আর এর জন্য দায়ী ছিলেন গান্ধী স্বয়ং। এর ফলেই ভারতবিভক্তি ও বঙ্গবিভক্তি অনিবার্য হয়ে উঠে। কাজেই বাংলা বিভক্তির জন্য নেহেরুর মত গান্ধীও দায়ী। প্রজালীগ মন্ত্রিসভা না হয়ে যদি প্রজা-কংগ্রেস মন্ত্রিসভা হতো তাহলে ১৯৪০ সালে লাহোর অধিবেশনে ফজলুল হক কর্তৃক পাকিস্তান প্রস্তাব উথাপিত হতো না। এর ফলে বাংলার এবং ভারতের রাজনৈতিক স্রোত সম্পূর্ণ অন্য খাতে প্রবাহিত হতো। বাংলার দুর্ভাগ্যের জন্য গান্ধী এবং নেহেরু প্রত্যক্ষভাবে দায়ী।

দুঃখের বিষয়, অনেক সুশিক্ষিত ও সচেতন বাঙ্গালীও জানেন না যে, তথাকথিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এর প্রথম প্রবক্তা ও জনক হচ্ছেন কলিকাতার অখন্ড ভারতবাদী একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী লেখক – যার নাম শ্রী সন্তোষ কুমার ঘোষ। ইনি 'কিনু গোয়ালার গলি' নামক উপন্যাসটি লিখে বিখ্যাত হয়ে যান। দিল্লীর স্বার্থের পক্ষে কাজ করতে গিয়ে জন্ম দিলেন 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের।'

ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের রচয়িতা বা প্রণয়িতারা জানতেন যে, বহুজাতি, বহুবর্ণ ও বহুভাষা সম্বলিত ভারতবর্ষের জন্য সর্বোত্তম সমাধান হচ্ছে বহুজাতিতত্ত্ব, দ্বিজাতিতত্ত্ব নয়। বাংলাদেশ এর অভ্যুদয়ের পর এখন ত্রিজাতিতত্ত্ব কার্যকর হয়ে আছে। আসলে ভারত এর বিচিত্র সমাজ কাঠামোর জাতিগত সমাধান খুঁজতে গেলে দেখা যাবে মাল্টি ন্যাশনাল থিওরীই সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য ছিল এবং ইতিহাসের অনিবার্য ধারা যদি অব্যাহত থাকে তবে ভবিষ্যতে একমাত্র বহুজাতিতত্ত্বই প্রযোজ্য হবে – একথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।

যেহেতু আমার মতে ভারত একটি বিশাল ভূখন্ড সেহেতু অখন্ড ভারতের তত্ত্ব একটি হাস্যকর চিন্তাধারা ছাড়া আর কিছু নয়। বিভিন্ন বিচিত্র জাতিসত্ত্বাকে অখন্ড ভারতের লেবাস পরিয়ে জোর করে এক পতাকাতলে কতদিন রাখা যাবে তাতে প্রশ্নের অবকাশ আছে - বিশেষভাবে এই আধুনিক সভ্যতার যুগে । এর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে। জার সম্রাটরা বিভিন্ন স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বাকে গায়ের জোরে এক করে রেখেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন এর সেই কৃত্রিম অখন্ডতা সম্প্রতি ভেঙ্গে পড়েছে। ভারত ইউনিয়নের কৃত্রিম অখন্ডতাও ধীরে ধীরে ভেঙে পড়বে এতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলা, পাঞ্জাব, মারাঠা, তামিল, কাশ্মীর ইত্যাদি জাতির অখন্ডতা অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক। পাকিস্তান এর অখন্ডতা কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক। ভারতের অখন্ডতা ও কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক।

আমার প্রশ্ন, যদি তিনটি মাত্র দেশ নিয়ে একটি মহাদেশ হতে পারে যেমন, নিউজিল্যান্ড, ফিজি আইল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া মিলে 'অস্ট্রেলিয়া' নামক মহাদেশ হয়েছিল তাহলে পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং ভারত মিলে একটি 'ভারত মহাদেশ' হতে পারে না কেন ? লোকসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতবর্ষ অস্ট্রেলিয়া-র চেয়ে প্রায় ৫০ গুণ বড় হবে।

১৯৪৫ সনের পর থেকে অর্থাৎ বৃটিশ শাসন এর সমাপ্তি লগ্ন থেকে যদি ভারতবর্ষকে একটি মাহাদেশরূপে গণ্য করা হতো (জাতিসংঘ কর্তৃক) তাহলে জাতিগত কোন সমস্যা থাকতো না এবং সকলেই বাধ্য হতো ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানকেই মেনে নিতে এবং শান্তিপূর্ন উপায়ে এই বিশাল ভূ-খন্ডটি স্বাধীনতা লাভ করতো এবং সেই সঙ্গে জন্ম নিতো অনেকগুলো অখন্ড স্বাধীন জাতিসত্ত্বা যেমন বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, কাশ্মিরী, তামিল, গুজরাটী, পাঠানী, সিন্ধী ইত্যাদি। দিল্লী, হিমাচল, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এগুলো নিয়ে মূল ভারতের ভৌগোলিক ও জাতীয় অবয়ব সৃষ্টি হতে পারতো এবং তার সামুদ্রিক বন্দর হতো বোম্বে। পাকিস্তান সৃষ্টির কোন প্রয়োজন দেখা দিত না। কারণ যে সব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল সেসব প্রদেশে তারাই সরকার গঠন করতে পারতো তাহলে দেখা যাচ্ছে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানই ছিল সর্বোত্তম সমাধান যাকে ব্যর্থ করে দিল শুধুমাত্র একজন অবাঙ্গালী নেতা - কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি শ্রী জওহরলাল নেহেরু। আর তাকেই কংগ্রেস এর সভাপতি বানিয়েছিলেন মাওলানা আজাদ। কাজেই পরোক্ষভাবে তিনিও দায়ী, মন্ত্রী মিশন প্রস্তাবের ব্যর্থতার জন্য। ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান ব্যর্থ হওয়াতে ভারত দ্বিখন্ডিত হলো আর সেই সাথে বাংলা এবং পাঞ্জাবও দ্বিখন্ডিত হলো। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে বাংলা দ্বিখন্ডিত হওয়ার অভিশাপ এর জন্য দায়ী প্রধানতঃ তিনজন অবাঙ্গালী নেতা নেহেরু, প্যাটেল এবং গান্ধী যারা ভারত-বিভক্তির জন্যও দায়ী ছিলেন যারা তাদের আচরণের দ্বারা মুসলিম লীগকে ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী করেছিলেন, যদিও পরোক্ষভাবে। মিস্টার জিন্নাহ ছিলেন নিমিত্ত মাত্র। মিস্টার জিন্নাহ কখনও প্রকাশ্যভাবে বাংলা বিভাগ চাননি কিন্তু তার পদক্ষেপ এই বিভাগকে ত্বরান্বিত করেছিল। কাজেই জওহেরলাল নেহেরুকে পাকিস্তানের সহজনক বলা যাবে। একই সূত্রে তাকে বিভক্ত পাঞ্জাব এবং বিভক্ত বঙ্গেরও জনক বলা যাবে।

একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নে যে, গান্ধীর কার্যকলাপ বাংলার মুসলিম লীগের শক্তি বৃদ্ধি করেছিল অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অনিবার্য করে তুলেছিল। বর্তমান ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নে যা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তাহলো নতুন প্রজন্ম কর্তৃক নেহেরু এবং গান্ধীর সঠিক মূল্যায়ন। এই দুই নেতা ধরতে গেলে বাংলার অখন্ডতার পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করেন। এরা যদি ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান কার্যকর করতেন তাহলে বাংলা–আসাম একটি বিপুল সম্ভাবনাময় অখন্ড রাজ্য হতো।

আসলে ঘরের দুয়ারে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদের জোয়ার দেখে সন্তোষ কুমার ঘোষের মত অখন্ড ভারত প্রেমীরা শংকিত হয়ে পড়ে। মৈত্রেয়ী দেবীর ভাষায়, 'এদের ভয়, স্বাধীন বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তার ভিত্তিতে যদি একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হয়ে উঠে এবং ধর্ম গোত্র নির্বিশেষে সকল বাঙালীর অধিকার ও স্বার্থ সুনিশ্চিত হয় তাহলে কালক্রমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসামের কাছাড় এবং বিহারের পূর্ণিয়া পর্যন্ত বাংলা ভাষাভাষী বিরাট এলাকা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার এবং বাংলাদেশের সাথে যুক্ত হওয়ার আন্দোলন শুরু হতে পারে। এমনিতেই পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতায় দিল্লীর বৈষম্যনীতির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ রয়েছে। এরপর আন্দোলন শুরু হলে ভারতের অন্যান্য নিপীড়িত এবং অচ্ছুৎ জাতিসত্ত্বাগুলো বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। তা যদি হয় তবে বর্তমান ভারতের অবশিষ্ট অখন্ডতাও টিকে থাকবে না বলে এদের আশঙ্কা।'

বাঙালী জাতীয়তাবাদ হচ্ছে আদি এবং অকৃত্রিম, হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত এবং বিকশিত। হিন্দুস্তানী বা পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের মত ভেজাল এবং ঠুন্‌কো নয়। এ দুটো জাতীয়তাবাদ অত্যন্ত অপরিণত কারণ এদের বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর। ১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্ট প্রথমটির জন্ম, দ্বিতীয়টির জন্ম তার একদিন আগে অর্থাৎ ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ বাঙালী জাতীয়তাবাদ নির্ভেজাল, কারণ তা ২৪ কোটি লোকের একটিমাত্র জাতিসত্ত্বার পরিচয় বহন করে। সেই তুলনায় ভারতীয় এবং পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ উভয়েই একাধিক জাতিসত্ত্বার গোঁজামিল হওয়াতে তা ভেজাল বা মিশ্র জাতীয়তাবাদে পরিণত (পাঁচমিশালী জাতীয়তা)।

পশ্চিমবাংলার লোককে একটি প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য তৈরি থাকতে হবে একুশ শতকের ইতিহাস এর কাছে। সে প্রশ্নটা হলো– তারা বঙ্গমাতার সন্তান হিসেবে পরিচয় দিতে বেশী গৌরব বোধ করেন, না ভারতমাতার সন্তান হিসাবে পরিচয় দিতে বেশী গৌরব বোধ করেন। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর এর মধ্যেই নিহিত আছে বৃহত্তর বাংলার ভবিষ্যত নিয়তি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তারা বঙ্গমাতাকেই বেশী গ্রহণযোগ্য মনে করবেন। এর অন্যথা হলে ইতিহাসের এক নিষ্ঠুর পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে হবে তাদেরকে। সে পরিণতি নিঃসন্দেহে হবে রক্তাক্ত ও আত্মবিনাশী।

ব্রিটিশরা ১৯৫৭ সালে যে আকারে বাংলাকে দখলে নিয়েছিল, দখল ফেরত দেবার সময় সেই আকারেই ফেরত দেয়া উচিত ছিল বলে আমি মনে করি। অর্থাৎ বাংলার নবাবী আমলের সীমানা যা ছিল– সিরাজ এর বাংলা – "বিহার, উড়িষ্যা আসাম, আরাকান" সহ গোটা বাংলাভাষী এলাকা বাঙালীদের দখলে ফিরিয়ে দেয়া উচিত ছিল। বাংলা দখল করার সময় দিল্লীর প্রভুদের সাথে আলোচনা করার বা তাদের মতামত নেয়ার কোন প্রয়োজন হয়নি বৃটিশদের, কিন্তু দখল ফিরিয়ে দেবার সময় দিল্লীর একাধিক প্রভুর সাথে অর্থাৎ নেহেরু জিন্নাহ, প্যাটেল, গান্ধী এদরে সাথে আলোচনা করে তাদেরই ইচ্ছানুযায়ী বাংলার এক খন্ড দিল্লীর হাতে আরেক খন্ড করাচীর হাতে তুলে দিয়ে নিরাপদে চলে গেলেন বিদেশী প্রভুরা। গ্রেট বেঙ্গলকে ভেঙে দিয়ে গেলেন অথচ গ্রেট বৃটেন এর আকারকে আরো মজবুত করলেন; আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও ওয়েলস্‌কে জোর করে যুক্তরাজ্যের মধ্যে ধরে রাখলেন অথচ আড়াই হাজার বছরের যুক্তরাজ্য বাংলাকে বিযুক্ত করে দিলেন অনায়াসে। এটা শুধু অস্বাভাবিক নয়– অপ্রাকৃতিকও বটে। শাশ্বত বাংলা বা আদি বাংলাকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব, যদি বাঙালী জাতির মধ্যে প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস জাগানো সম্ভব হয়। সেই নেতৃত্বকেই আবহমান বাংলার মানুষ বরণ করবে সর্বান্তকরণে, যে নেতৃত্ব সমগ্র জাতির মধ্যে প্রবল আত্মবিশ্বাস জাগাতে সক্ষম হবে এবং বঙচেতনা সঞ্চার করতে পারবে প্রতিটি বাঙালীর রক্তের শিরায় শিরায়।

ভারতবর্ষের বিরাট আকার দেখে ভয় পাবার কোন কারণ নেই কেননা ধ্যান–ধারণা মতবাদ দ্বারাই পৃথিবী শাসিত হয়, শক্তির দ্বারা নয়। ইংরেজীতে একটা কথা আছে – "আইডিয়া গর্ভনস্‌ দ্যা ওয়ার্ল্ড।" বিশাল আকৃতি বা বিশাল সমরশক্তি দিয়ে কোন মুক্তিকামী সচেতন জাতিকে বেঁধে রাখা যায় না। পুরাতন মাতৃভূমিকেই নতুন রূপে তুলে ধরতে হবে সমগ্র জাতির সামনে। বঙ্গচেতনা তথা বঙ্গবাদ কি তা সকলকে বুঝাতে হবে সর্ববঙ্গবাদ মানে প্যান বেঙ্গলিজম। শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে, বচনে ও লিখনে সর্বত্র বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন থাকতে হবে ব্যক্তি এবং জাতি উভয়ের জীবনাচরণে।

বাঙ্গালদেশী আর বাঙালী বলে একই জাতিকে দুই ধরনের পরিচয়ে পরিচিত করবার যে হীন চক্রান্ত করা হয়েছে দিল্লী থেকে সে চক্রান্তকে রুখতে হবে। পাকিস্তানী অঞ্চলের পাঞ্জাবের লোকদের কি পাঞ্জাবদেশী বলা হয় ভারতীয় পাঞ্জাবের লোকদের থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য ? ভারতীয় অংশের লোকেরা যেমন পাঞ্জাবী, পাকিস্তনী অংশের লোকেরাও তেমনি পাঞ্জাবী। এক্ষেত্রে দিল্লীওয়ালারা পাঞ্জাবদেশী বলছে না কেননা পাঞ্জাবের কোন অংশই স্বাধীন নয়; কাজেই পূর্ব পাঞ্জাব যে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এমন আশংকাও নেই। দিল্লীর কর্তারা ভয় করেছিলেন যে, বাংলার বাংলাদেশ অংশের লোকদের বাঙালী বলা বিপজ্জনক হবে কেননা কোন একসময় পশ্চিম বাংলার অধিবাসীরা বাঙালী জাতীয়তাবাদের আবেগে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মূল বাংলাদেশ এর সাথে যোগ দিতে পারে – তাই বাঙালদেশী বা বাংলাদেশী নামটা দিল্লী থেকে চালু করা হয় সন্তোষ কুমার ঘোষ আর বসন্ত চাটার্জীর মত চাটুকার বুদ্ধিজীবীদের হাত দিয়ে যা পরে খন্দকার আবদুল হামিদ আর আবুল

মনসুর আহম্মদ লুফে নেন। এরা দুজনে পরবর্তীকালে দিল্লী - নির্মিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মহাউৎসাহী প্রবক্তা বনে যান। এরা দুজনে বাংলাদেশ এর প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে একথা বুঝাতে সক্ষম হন যে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ভরতীয় আধিপত্য, প্রভাব এবং প্রাধান্য থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করবে। সরল বিশ্বাসে জিয়াউর রহমান এই নব আবিষ্কৃত জাতীয়তাবাদকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন। খুব সম্ভবতঃ তিনি এর সুদুর প্রসারী প্রতিক্রিয়ার কথা বুঝতে পারেননি। কিন্তু যে তত্ত্ব ভারতের রাজধানী দিল্লী থেকে রপ্তানী করা হয়েছে তা কেমন করে ভারতীয় প্রভাব থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করবে ? হিন্দু-মুসলমান উভয় ধরনের পাঞ্জাবীকে পঞ্জাবী বলছেন ভারতীয় নেতারা। হিন্দু-মুসলমান উভয় ধরনের কাশ্মীরীকে কাশ্মীরীই বলছেন। অথচ হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেনীর বাঙালীকে বাঙালী বলতে রাজী নয় দিল্লীর কর্তারা। এটা খুবই লক্ষণীয় ব্যাপার যে, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর এর দুই খন্ড দুই দেশে পড়েছে যেমন পড়েছে বাংলার দুই খন্ড। বাঙালী জাতীয়তাবাদের দুর্নিবার আকর্ষণে একদিন পশ্চিম বাঙলা ভারত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার জন্য আন্দোলন করতে পারে!

একজাতিতত্ত্ব বা ওয়ান ন্যাশন থিওরী হচ্ছে বাঙালী জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি। এটা দ্বিজাতিতত্ত্বের সম্পূর্ণ উল্টো তত্ত্ব। সে কারণে এটা সমগ্র ভারতবর্ষের ব্যাপারে খাটে না কেননা এ বিশাল মহাদেশ-সম ভূখন্ডটি ইতিহাসের কোন লগ্নেই একজাতি একদেশ ছিল না। কিন্তু বাঙালী ও বাংলা একজাতি একদেশ ছিল এবং প্রায়ই স্বাধীন ছিল। যেমন সাড়ে পাঁচশত বছরের মুসলিম শাসনামলেও সাড়ে তিনশত বছরই দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, স্বাধীন ও সার্বভৌম ছিল এ বাংলা অর্থাৎ অবিভক্ত বাংলা কারণ মুসলমান শাসকরাই মূলতঃ খন্ডিত বাংলাকে একত্রিত করতে পেরেছিলেন। এ কৃতিত্ব তাদের ।

১৯৩৭ সনে যখন বার্মাকে ব্রিটিশ ভারত থেকে পৃথক করে আলাদা একটি রাষ্ট্র ও জাতিতে পরিণত করা হয় তখন যদি বাংলা-আসামকেও ব্রিটিশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হতো তাহলে আমরা অতীতের অবিভক্ত বড় বাংলাকেই দেশ হিসাবে পেতাম, ১৯৪৭ সালের অনেক আগেই। ভারত বিভাগের প্রতিক্রিয়া বাংলার উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারতো না যেমন করে বার্মা অবিভক্ত ছিল ভারত বিভাগের পরও তেমনি করে বাংলাও অবিভক্ত ছিল ভারত বিভাগের সময়ে; ত্রিপুরা ও আসাম অর্ন্তভুক্ত থাকতো বাংলার সীমানার মধ্যেই। বঙ্গবলয়ের রাজ্যগুলো এক জাতীয়তা, এক পতাকা ও একদেশের অখন্ডতা নিয়ে বিরাজ করতে পারতো।

বিকল্প সম্ভাবনা আরেকটি ছিল। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার তত্ত্ব মেনে নিয়ে যদি বাঙালী হিন্দুরা (গোটা বাংলা-আসাম অঞ্চলকে ভাগ না করে) পাকিস্তানে অর্ন্তভুক্ত হতে রাজি হতো তাহলে সেই বৃহত্তর পূর্ব পাকিস্তান হতো নামান্তরে বৃহত্তর বাংলা-আসাম (যা হতো এক বিশাল ভুখন্ড এবং লোকসংখ্যা হতো পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় দ্বিগুণ)। ১৯৫২

সালের ভাষা আন্দোলনের এর পরপরই স্বাধীনতার আন্দোলন করতে পারতো এবং বৃহত্তর স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতো, ১৯৭১ এর অন্ততঃ দশ বছর আগেই অর্থাৎ ১৯৬০ সালের মধ্যেই জন্ম নিত অবিভক্ত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ যা অবশ্যই পাকিস্তান বিরোধী হতো কিন্তু হিন্দুস্তান পন্থী হতো না এবং আমরা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারতাম (ভারতকে যদি এক জাতি না ধরি)। আমাদের মাতৃভাষা সারাবিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম কথিত ভাষা।

আজকের পশ্চিম বাংলাকেও হিন্দুস্তানপন্থী বলা যায় না। দিল্লীর শাসন–শোষণের বিরুদ্ধে একটা চাপা ক্ষোভ পশ্চিমবাংলার সর্বত্র বিরাজ করছে। আরেকটি আশার কথা এই যে, বর্তমান পশ্চিমবাংলার আনাচে–কানাচে যত যত ঘটা করে শহীদ দিবস বা ভাষা দিবস পালিত হয় তা খোদ বাংলাদেশেও হয় না। শুধু ব্রিটিশরাই বাংলাকে ভাগ করেনি তাদের সহযোগী ছিল হিন্দুস্তানপন্থী কংগ্রেসী নেতারা এবং পাকিস্তানপন্থী মুসলীম লীগ নেতারা। একটি কমন ফ্যাক্টর হচ্ছে এরা সবাই ছিলেন অবাঙালী নেতা। বাঙালী মুসলমানরা তো বঙ্গভঙ্গ চায়নি। পশ্চিম বাংলার বাঙালী হিন্দুরা চেয়েছিল কলিকাতা আর নোয়াখালীর দাঙ্গার কারণে (জনগণ নয় তাদের এম, এল, এ রা)। মাত্র কয়েক সপ্তাহের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসের ধারাকে বদলে দিয়েছিল । একথা ভাবতেও অবাক লাগে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সন্ত্রাসীর সৃষ্ট তান্ডবলীলা বাংলার ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। এটা শুধু অস্বাভাবিকই নয় অপ্রাকৃতিকও বটে। অথচ সেই অস্বাভাবিক কাজটাই করেছিল আমাদের অদূরদর্শী নেতারা। অতীতের সেই ভুলকে অবশ্যই শোধরাতে হবে এবং এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত বর্তায় পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরার নবীন প্রজন্মের বাঙালীদের উপর। একটি সমগ্র জাতির ইতিহাস ও নিয়তি কি শুধু দুই চারটি দাঙ্গার দ্বারা নির্ধারিত হয় ?

এই বাংলাদেশের ইতিহাসে একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষনীয়। তাহলো বারেবারে অদূরদর্শী রাজনৈতিক নেতাদের সিদ্ধান্ত এবং ভুল নির্দেশনার ফলে কোটি কোটি মানুষ এর অশেষ ভোগান্তি হয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলো এদের আকস্মিক সিদ্ধান্তের ফলেই সংঘটিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ এর কোন ভূমিকা ছিল না এসব কর্মকান্ডে।

একজন ডাক্তার ভুল করলে একজন রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে। কিন্তু একজন নেতা ভুল করলে একটা গোটা জাতির মৃত্যু ঘটতে পারে। একজন আনাড়ি ড্রাইভার বা গাড়িচালক একটা মজবুত গাড়িকে ভেঙে ফেলতে পারে অসতর্ক চালনা ও অতি দ্রুত গতির কারণে তেমনি একজন আনাড়ি নেতা বা জাতির চালক একটি সুসংবদ্ধ মজবুত জাতিকেও ভেঙ্গে ফেলতে পারে যেমন ভেঙে ফেলা হয়েছিল জাতিকে ১৯৪৭ এ। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ চালু আছে বর্তমান বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দক্ষিণ বাংলায়, উত্তর বাংলায় এবং পূর্ববাংলায় তাহলে পশ্চিম বাংলায় চালু হতে বাধা কোথায় ? বাধা একটা জায়গায়। ১৯৪৭ এ পশ্চিম বাংলার লোকেরা (তাদের এম এল এ রা) ভুল করে হিন্দুস্তান চেয়েছিল যেমন পূর্ববাংলার লোকেরাও

ভুল করে পাকিস্তান চেয়েছিল। ১৯৪৭ এর ভুলকে সংশোধন করতে সহায়ক শক্তির সাহায্য নিয়ে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে পশ্চিম বংলার লোকেরা।

যে কোন বুদ্ধিমান শিশুও প্রশ্ন করতে পারে – যে দেশে উত্তর, দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল আছে সে দেশের পশ্চিম অঞ্চল ভারতীয় দখলদারিত্বে থাকবে কেন ? যেমন একদিন পূর্ববাংলা ছিল পাকিস্তানী দখল দারিত্বে। যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বঞ্চনার কারণে এই বাংলায় জাতীয়তাবাদী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে সেই অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার আজকের পশ্চিম বাংলাও। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি আজ বিলুপ্তির পথে। হিন্দি বলয় থেকে ভেসে আসা অপসংস্কৃতির জোয়ারে বঙ্গবলয় এর ভাষা–সংস্কৃতি আজ ডুবে যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলা তার বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছে সকল ক্ষেত্রে, ভাষায়, সংস্কৃতিতে, আচারে ও কৃষ্টিতে। অপমৃত্যু ঘটছে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ কালচার এর। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম এবং এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম কথিত ভাষা হচ্ছে বাংলা। এতবড় ভাষা সংস্কৃতির ধারক বাহক যে বাঙালী জাতি তার সুপ্তচেতনা কেবল জাগরণের অপেক্ষায় রয়েছে। রূপকথার রাজপুত্রের সেই জাদুর কাঠির মত ঘুম ভাঙাতে এগিয়ে আসবে বৃহত্তর অখন্ড বাংলার সেই উদীয়মান নতুন নেতৃত্ব যা অনাগত ভবিষ্যত এর গর্ভ থেকেই জন্ম নেবে। যে জাতীয় চেতনা যুগ যুগ ধরে সুপ্ত অবস্থায় ঘন তমসার আড়ালে লুকিয়েছিল তা আজ জেগে উঠবে নতুন প্রজন্মের সবুজ, সতেজ ও সজাগ তরুণদের আত্মবিশ্বাসের জোরে।

বাংলার মহানায়ক শহীদ শেখ মুজিবুর রহমান "সোনার বাংলা" কথা বলেছিলেন, মহান মুক্তিযোদ্ধা শহীদ জিয়াউর রহমান "সবুজ বাংলার" কথা বলেছিলেন। সেনানায়ক এরশাদ "নতুন বাংলা" গড়বেন বলেছিলেন। কিন্তু আমি বলছি "পুরাতন বাংলার কথা"। আমি শুধু পুরাতন বাংলাকেই ফিরে পেতে চাই, পুনরায় গড়তে চাই। সর্বাত্মক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মানেই হচ্ছে বঙ্গবাদী আন্দোলন যার ব্যাপ্তি হবে পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের বিশাল ভূখন্ড। এ অঞ্চলের সকল বঙ্গভাষীরাই বঙ্গবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পশ্চিমবাংলার মানুষ আজ নিজ দেশে পরবাসী হয়ে আছে। ত্রিপুরা, আসামের অবস্থাও ভিন্ন নয়। প্রবীণ ও বয়স্ক বাঙালীদের আজও মনে আছে ১৯৪৭ এ বাংলাকে তিন টুকরা করার কথা (পশ্চিমবাংলা, পূর্ববাংলা, ত্রিপুরা) এবং পরবর্তীতে আসামকে সাত টুক্‌রা করার কথা। বাংলা–আসামের দশটি খন্ডিত অঞ্চলের হতভাগ্য অধিবাসীদের কাছে পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় সরকার বা হিন্দুস্তানী কেন্দ্রীয় সরকার কোনটাই কেন্দ্রাভিমুখী কোন আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। ধর্মের মোহ বা নেশার ঘোর অনেক আগেই কেটে গেছে কঠিন বাস্তবের কষাঘাতে। তার প্রমাণ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা, যদিও তা পূর্ণাঙ্গ হয়নি কেননা পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা ইত্যাদি রাজ্য তারপরও পরাধীন তথা অবাঙালী ভারত সরকার এর অধীনে থেকে যায়। হিন্দু বাঙলা যদি বাংলাদেশ এর বাইরে থাকে সে দেশ পূর্ণাঙ্গ ধর্ম–নিরপেক্ষ হয় কি করে ?

বঙ্গবাদের লক্ষ্য হলো ভারতবর্ষ নামক বহুজাতি ভিত্তিক মহাদেশ সম ভূখন্ডটিতে সকল বাঙালীর জন্য একটি পৃথক বাসভূমির পুনঃপ্রতিষ্ঠা, যে বাসভূমি অতীত বঙ্গদেশ নামেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেজন্যই পুনঃপ্রতিষ্ঠা কথাটির উল্লেখ করছি। বাঙ্গালী জাতির জন্য এটা কোন আকস্মিক নবজন্ম নয় – এটা পুনর্জন্ম। কারণ বঙ্গজাতি হাজার হাজার বছর আগে থেকেই বিরাজ করছিল। জাতি ও জাতিসত্ত্বা সুপ্ত অবস্থায় ছিল দীর্ঘকাল যেমন পশ্চিমবাংলায় তা অর্ধসুপ্ত, অর্ধবিকশিত, অবস্থায় আছে বর্তমানে।

বাঙালী জাতির জন্য একটি আলাদা পতাকা, আলাদা পরিচয়, আলাদা মর্যাদা, আলাদা গৌরব অর্জনকারীর ভূমিকায় শুধু বাংলাদেশ ভূখন্ডের বাঙালীরাই অবতীর্ণ হয়েছিল একথা বললে কিছুটা ভুল হবে। পশ্চিমবাংলার বাঙালীরাও সহায়ক শক্তি হিসেবে তাদের ভূমিকা রেখেছিল। কলিকাতায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা, পশ্চিমবাংলার মানুষের অবদান। তারাই ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল যাতে বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী সাহায্য করে। বিকল্প কোন পথ খোলা ছিল না বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন না করে এবং সে সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না নিয়ে। কেননা তাহলে গোটা পশ্চিমবাংলা ত্রিপুরা–আসাম দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠতো তখনই। বৃহত্তর ঝুঁকি এড়ানোর জন্যই তারা ক্ষুদ্রতর ঝুঁকি নেবার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।

পশ্চিমবাংলার বাঙালীরা মুক্তি সংগ্রাম এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেননি তাদের সীমাবদ্ধতার কারণে। তারা অপেক্ষা করেছিলেন একটি নেতৃত্বের জন্য – একটি আহবানের জন্য এবং তাকিয়ে ছিলেন পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশ এর দিকে। তারা আশা করেছিলেন – এপার বাংলার জনক ওপার বাংলারও জনক হবেন। কিন্তু তাহলো না। সব স্বপ্ন সবসময় সফল হয় না। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এর সাথে মিত্রতাই তখনকার পরিস্থিতিতে অনিবার্য ও অপরিহার্য ছিল। শেখ মুজিব এর পক্ষে সম্ভব ছিল না সেই বাধ্যবাধকতার বাস্তবতাকে অতিক্রম করে নাটকীয় কিছু করে বসার। অবশ্য করলে কি হতো তা বলা যায় না। কারণ পশ্চিমবাংলার মানুষ তখন তাকে গণদেবতার মতো পুজো করতো। তার ব্যক্তিত্ব তখন পশ্চিমবাংলায় বিপ্লব ঘটাবার মত শক্তি ও প্রভাব রাখতো। কিন্তু তা তিনি করেননি এবং না করে রাজনৈতিক বিচক্ষণতা বা রাষ্ট্রনায়কসুলভ দূর দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন বলেই আমার বিশ্বাস। যে কোন ধরনের রাজনৈতিক এ্যাডভেঞ্চার বাংলার আকাশে মহাদুর্যোগের ঘনঘটা সৃষ্টি করতে পারতো। বাঙালীর মহান মুক্তি সংগ্রাম এর সবচেয়ে কঠিন স্তর অর্থাৎ প্রথম স্তর তিনি সফলতার সাথেই অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয় স্তর তিনি রেখে গেছেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এবং পশ্চিমবাংলার নতুন নেতৃত্বের জন্য। বিশাল হিন্দুস্তানী পরাকেন্দ্রীয় শক্তির ভয় পশ্চিম এর বাঙালীদের এ কাজ হতে বিরত রাখে। কিন্তু সে ভয় অনেকটা অমূলক। মানুষের মনে এবং আত্মায় যখন পরিবর্তন ঘটে তখন সে পরিবর্তনকে কোন শক্তিই প্রতিরোধ করতে পারে না। এটা হলো ইতিহাস এর এক অমোঘ অপ্রতিরোধ্য আইন। যে আইন মানব ইতিহাসের প্রধান চালিকাশক্তি।

অদুর ভবিষ্যতে অবশ্যই পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা এবং আসাম অঞ্চল দৈহিকভাবে মূল ভূখন্ড হিন্দুস্তান বা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। পূর্ব হিমালয় অঞ্চল আমাদের পিতৃ পুরুষদের আদি বাসভূমি অর্থাৎ বাঙালীদের পিতৃভূমি মাতৃভূমি যাই বলি সমগ্র পূর্ব ভারতীয় অঞ্চল আসলে বঙ্গীয় সভ্যতারই পীঠভূমি; ভারতীয় সভ্যতা বারেবারে তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। গঙ্গার প্রবাহকে কি ফারাক্কা বাঁধ সম্পূর্ণ আটকে রাখতে পারবে ? উজান দেশের স্রোত অবশ্যই গড়িয়ে নেমে আসবে ভাটির দেশে। উজান এর বাংলা আর ভাটির বাংলা কি ভিন্ন হতে পারে ? স্বাভাবিক স্রোতোধারাকে যেমন বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায় না তেমনি স্বাভাবিক জাতীয়তার প্রাণপ্রবাহকে সীমান্ত রেখা দিয়ে আবদ্ধ রাখা যায় না। "হুজুগে বাঙালী আর হেকমতে চীন" বলে একটা প্রবাদ চালু আছে। বাঙালীর হুজুগ এ ব্যাপারে গঠনমূলক অবদান রাখতে পারে। পশ্চিম বাংলায় ভাষা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক মুক্তির আন্দোলন শুরু হতে পারে যে কোন সময়। বায়ান্ন সনের ভাষা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে কলিকাতা ও তার আশেপাশের অঞ্চলে যার পরিণতিতে প্রথমে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা আসবে গোটা পশ্চিম বাংলা ও ত্রিপুরায়। পরবর্তীতে আসবে সত্যিকার স্বাধীনতা – যা গোটা বাংলা অঞ্চলকে একটিমাত্র পতাকার নীচে টেনে নিয়ে আসবে। সমগ্র বিশ্ব অবাক হয়ে দেখবে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙালী 'একজাতি একদেশ' এই পরিচয়ে গরিয়সী বাংলাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। একুশ শতক এর সূচনাতেই বাঙালীর শ্রেষ্ঠতম অর্জন হবে স্বাধীন সার্বভৌম অখন্ড বাংলার প্রতিষ্ঠা – যার ফলশ্রুতিতে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতিসত্ত্বার বিকাশ ঘটবে মহাগৌরবে। বাংলা ভাষা যে সারা দুনিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম কথিত ভাষা একথাও বিশ্ব সম্প্রদায় অবহিত হবে।

স্বাধীন অখন্ড বৃহত্তর বাংলা ও আসামের গঠন প্রক্রিয়া সম্ভব হতে পারে দুইটি বৈপ্লবিক স্তরে উত্তরণের মাধ্যমে। প্রথম ধাপে ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে গোটা পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা ও আসাম অঞ্চলকে। দ্বিতীয় ধাপে মূল বাংলাদেশের সাথে কনফেডারেশন গঠনের মাধ্যমে যুক্ত হতে হবে এই তিন রাজ্যকে। ইংলিশ প্রজাতন্ত্র, আইরিশ প্রজাতন্ত্র, স্কটিশ প্রজাতন্ত্র মিলে যদি "গ্রেট বৃটেন" এর মধ্যে থাকতে পারে তবে বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র কেন "গ্রেট বাংলা"র মধ্যে থাকতে পারবে না? অনেক বিভেদ সত্ত্বেও তারা যুক্তরাজ্য গঠন করেই আছে। আমাদের ঔপনিবেশিক প্রভু ব্রিটেন যদি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ও সংস্কৃতির রাজ্য নিয়ে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য বানাতে পেরে থাকে তবে একই ভাষা ও সংস্কৃতির তিনটি রাজ্য নিয়ে আমরা কেন 'বাংলা – যুক্তরাজ্য' গঠন করতে পারবো না? স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড আর ওয়েলস এর সাথে ইংল্যান্ডের যত পার্থক্য ও দূরত্ব বিদ্যমান পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা আর আসাম এর সাথে বাংলাদেশের পার্থক্য ও দূরত্ব সেই তুলনায় অনেক কম (শুধু ধর্মের পার্থক্য বাদ দিলে)।

বাঙালীর হুজুগ আর চীনের হেকমত এক করতে পারলে এক মহাশক্তির উদ্ভব হবে যা সর্ববঙ্গবাদ বা মহাবঙ্গবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি হবে। একটা চরম

সত্য হলো বৃহত্তর বাংলা গঠন করতে গেলে ভারতকে ভাঙ্গতেই হবে। সেই ভাঙ্গা গড়ার কাজ হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন পদক্ষেপ যা গ্রহণ করতে গেলে চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, বার্মা এসব দেশের সমর্থন অপরিহার্য হবে। এটা একটা সুকঠিন বাস্তব। এ সাধনার পথ হবে দুর্গম, বেদনাময়। বাংলার বিচ্ছিন্ন খন্ডগুলোকে সুসংহত করতে পারবে যে নেতৃত্ব সেই নেতৃত্বই একমাত্র গ্রহণযোগ্য হবে বিশ্বের সকল বাঙালীর কাছে।

এক কালের "গ্রেট বেঙ্গল" যে আমাদের হারানো স্বর্গ তা কে না জানে ? ভবিষ্যতের সম্ভাব্য যুক্তবাংলা পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে চীনের জন্য এক মহা সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে। কেননা বাংলাদেশের পর থেকে যতই পূর্বদিকে যাওয়া যায় দেখা যাবে গোটা দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া দুর্গম পার্বত্য এলাকা হিসেবে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাগরে যাওয়ার কোন সমতল পথ নেই চীনের জন্য। একমাত্র আদর্শ সমতলীয় করিডোর হতে পারে ভবিষ্যতের যুক্ত বাংলাদেশ যার সীমানা চীন দেশের সীমানার সাথে অভিন্ন হয়ে যাবে উত্তরাঞ্চলে। শান্তির সময়ে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে স্থল পথে পণ্য রফতানী এবং আমদানী করতে পারবে। আর যুদ্ধের সময়ে চীন তার সরবরাহ পথ নিশ্চিত করতে পারবে ভারত মহাসাগরে ভাসমান চীনা নৌবহর এর সাথে।অবশ্য যদি তখনকার বাংলাদেশের সরকার উত্তর দক্ষিণে ট্রানজিট দেয় চীনকে।

ভারত মহাসাগরে বা বঙ্গোপসাগরে যদি চীনকে কখনও সবচেয়ে দ্রুত আসতে হয় তবে বেঙ্গল করিডোরই হবে সবচেয়ে আদর্শ করিডোর যা পর্বতংকুল বা অরন্য সংকুল নয়। সমগ্র দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়াকে পাশ কাটিয়ে তাকে আসতে হবে নেপালের বিরাট নগর থেকে বাংলাদেশের তেঁতুলিয়া হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত। এই কয়েক মাইল ভারতীয় এলাকা আসলে বিশুদ্ধ বঙ্গীয় এলাকা হবে যখন বঙ্গবাদ পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এই এলাকা দিয়ে ঢাকা আসার জন্য সম্প্রতি নেপালকে একটি ট্রানজিট সুবিধা দেয়া হয়েছে ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে। দিল্লীতে নতুন নেতৃত্ব আসার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে।

যেকোন বড় লক্ষ্য অর্জন করতে গেলে যে পরিমান চর্চা ও অনুশীলন দরকার তাকে বলে সাধনা। সমগ্র বাঙালী জাতির নেতাদের এ সাধনায় নিয়োজিত হতে হবে। কোন বিষয়ে সস্তা আবেগ এর রাজনীতি দ্বারা জাতিকে ভুল পথে পরিচালনা করা সমীচীন নয়। যেমন আমরা ভারতকে নিশ্চিন্তে ট্রানজিট দিতে পারি এই শর্তে যে, বিনিময়ে ভারত আমাদেরকে ট্রানজিট দেবে নেপাল, ভুটান, এবং চীনে যাওয়ার জন্য। যাতে করে আমরা স্থলপথে চীনে যেতে পারি এবং আমদানী রপ্তানী ও পর্যটনের দ্বিমুখী ধারা অব্যাহত রাখতে পারি। চীন, নেপাল, ভুটান, ত্রিপুরা, আসাম ও পশ্চিমবাংলা থেকে বেশি বেশি পর্যটক বাংলাদেশে আসতে থাকলে এ অঞ্চলে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ এর ক্ষেত্রে এক বিশেষ ধরনের মেরুকরণ হবে।

আমাদের সমাজে একটা অস্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সেটা হলো জাতীয় পরিচয় এর পূর্ণতা লাভের দিকে নজর না দিয়ে আমরা কেবল তন্ত্র, মন্ত্র নিয়ে মাথা ঘামাই। মায়ের পেট থেকে বঙ্গশিশুটি সম্পূর্ণ ভূমিষ্ট হওয়ার আগেই আমরা অস্থির হয়ে উঠলাম সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র আর মিশ্রতন্ত্র নিয়ে। জাতিতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে পশ্চিমবাংলা আজ মেতে আছে মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র নিয়ে অথচ তার বাঙালী পরিচয় বিলীন হয়ে যাচ্ছে তথাকথিত ভারতীয় জাতিতন্ত্রের চাপে এবং হিন্দি ভাষা ও সংস্কৃতির জোয়ারে। বাংলাদেশে বাকশাল এর ভিক্তি অভিজ্ঞতা থেকে পশ্চিম বাংলার সমাজতন্ত্রীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তন্ত্রমন্ত্রের ব্যাপারটি কোনমতেই প্রাথমিক স্তরের বিষয় নয় – এটা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের ব্যাপার। একটি দেশ ও জাতির জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো তার জাতীয় পরিচয় বা জাতিসত্ত্বার পূর্ণ বিকাশ। সেটাই মুখ্য. অন্য সব লক্ষ্য হলো গৌণ বা দ্বিতীয় পর্যায়ের। জাতি হিসাবে যদি কোন অংশের পরিচয় সংকট থেকে যায় তবে সে জাতি পূর্ণ বিকশিত নয়। অর্থাৎ পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ জাতি নয় যেমন বাংলাদেশ আন্দোলন আসলে একটি অসমাপ্ত আন্দোলন কেননা আমরা জাতি হিসাবে যতোটা বড়, দেশ হিসাবে তত বড় নই। পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা আসাম, আরাকান আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ্য। এটা ঐতিহাতিক সত্য এরা বিভিন্ন রাজ্য বা স্টেট্স-এ বিভক্ত কিন্তু এরা সবাই বঙ্গবলয় এর রাজ্যমন্ডলী। এগুলো মিলে কনফেডারেশন বা মিত্ররাষ্ট্র গঠন করার চিন্তা–ভাবনা থাকা উচিত সকল বাঙালীর মধ্যে। প্রস্তাবিত "বাংলাদেশ যুক্তরাজ্য" নামক কনফেডারেশন এ যোগ দেয়া বাধ্যতামূলক হবে না বরং আঞ্চলিক সহযোগিতা চুক্তিভিত্তিক হতে পারে। একটা কেন্দ্র অবশ্যই থাকতে পারে যার হাতে শুধু অর্থ এবং বৈদেশিক দপ্তর থাকবে। সদস্য রাজ্যগুলো সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতে পারবে। "ইউনাইটেড স্টেট্স অব বাংলাদেশ এন্ড আসাম" ভবিষ্যতের একটি রাজনৈতিক বাস্তবতা বলে প্রতীয়মান হয়। তবে তার আগে পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের রাজ্যগুলোকে অবশ্যই স্বাধীন হতে হবে। দিল্লীর উপনিবেশ হিসেবে না থেকে এ অঞ্চলের সকল রাজ্যকেই প্রথমে স্বাধীন এবং সার্বভৌম হতে হবে। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে গঠিত হতে পারে বাংলা কনফেডারেশন । প্রথমে গোটা হিমালয় অঞ্চলের স্বাধীনতা, দ্বিতীয় পর্যায়ে বঙ্গীয় ভূখন্ডসমূহের পুনর্বিন্যাস, তৃতীয়ত ফেডারেশন সম্ভব না হলেও অন্তত বাংলাভিত্তিক কনফেডারেশন গঠন, বঙ্গীয় ভূখন্ডসমূহের পুনর্বিন্যাস ও একত্রীকরণের মাধ্যমে মহাবাংলা বা গ্রেট বেঙ্গল গঠনই ভবিষ্যতের বাস্তবতা, যা হবে ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য আইন। এই তিনটি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে একুশ শতকের মহান বাংলা। আমরা ভারতকে ট্রানজিট দিতে পারি এই শর্তে যে, আমাদেরকেও ট্রানজিট দিতে হবে ভারতের উপর দিয়ে নেপাল ভূটান এবং চীনে যাওয়ার জন্য। স্থলপথে এসব প্রতিবেশী দেশের সাথে আমদানী–রপ্তানী বাণিজ্য পরিচালনা করা সম্ভব হবে। আঞ্চলিক পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে স্থলপথে।

ইংরেজী ভাষার সাথে কোন মিল না থাকা সত্ত্বেও ইংল্যান্ডের পক্ষে স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও ওয়েলস্কে সঙ্গে নিয়ে যুক্তরাজ্য গঠন করা সম্ভব হয়েছিল যা গ্রেট বৃটেন নামে পরিচিত। দেখা যাচ্ছে বৃটিশ জাতীয়তাবাদ এর বাঁধন খুব মজবুত নয় যদিও ঐ জাতীয়তাবাদ

ঐক্যবদ্ধ রাজ্য "ইউনাইটেড কিংডম" নামে অভিহিত। গ্রেট বাংলার জাতীয়তাবাদ এর বাঁধন মজবুত থাকা সত্ত্বেও শুধু ধর্মের ধুয়া তুলে আমাদের অতীত প্রভু ব্রিটিশরা এবং তাদের সমর্থক অবাঙালী ও কিছু বাঙালী নেতা গ্রেট বাংলাকে ঐকবদ্ধ থাকতে দেয়নি অর্থাৎ যুক্তরাজ্য হতে দেয়নি। বাংলা বিভাগের ফলে শুধু পশ্চিম বাংলাই নয় মূল মাতৃভূমি বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আরো একাধিক বাংলা অঞ্চল ; ত্রিপুরার বাংলা, আসামের বাঙলা, উড়িষ্যার বাংলা এবং বিহারের বাংলা যা এককালে ছিল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার অধীনে। প্রায় ৭টি ছোট ছোট বাংলা মিলে বৃহৎ বাংলা হয় যেমন ৭টি ছোট ছোট আসাম মিলে বৃহৎ আসাম হয়। এসব রাজ্যের সাথে ভাষা ও সংস্কৃতির মিল থাকা সত্ত্বেও এবং অতীত অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও ১৯৪৭ এ "ইউনাইটেড স্টেট্স অব গ্রেট বাংলা এন্ড আসাম" গঠন করা গেল না; এক রাজনৈতিক দুর্বুদ্ধির ফলে, বাংলার দুই অংশের উপর অবাঙালী হিন্দুস্তান ও পাস্তিানের উপনিবেশিক কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখার স্বার্থে।

সমগ্র বঙ্গীয় অঞ্চল এর গণমানুষ অদূর ভাবিষ্যতে বিশুদ্ধ বঙ্গীয় সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদ এর উপাদান খুঁজবে তাদের অনাগত নেতৃত্বের মধ্যে। মানুষ যেমন বিশুদ্ধ তেল, ঘি ইত্যাদির খোঁজে কখনও সারাশহরে একটিমাত্র দোকানে যায় – তেমনি বিশুদ্ধ খাঁটি বাঙালী জাতীয়তাবাদ এর সন্ধানে বাংলার মানুষ এমন একটিমাত্র নেতৃত্বের কাছে যাবে যে নেতৃত্ব তাদেরকে স্বজাতির মূল শেকড় এর সন্ধান দিতে পারবে।

সর্বাঙ্গীন বাঙালী জাতীয়তাবাদ তথা "সর্ববঙ্গবাদ" সকল বাঙালীরই মনে আছে – অথচ মুখে নেই। এর কারণ সঠিক নেতৃত্বের অভাব। কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কোন দল কিংবা কোন গোষ্ঠি আজ পর্যন্ত দাবী করলো না যে, পশ্চিমবাংলা আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ; বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা ও আরাকানের বাংলাভাষী অঞ্চলও তাই। শুধুমাত্র সততা, সাহস ও বলিষ্ঠতার অভাবে আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্বসমূহ সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতার সংকীর্ণ গন্ডি অতিক্রম করতে পারছে না। এটা এক ধরনের পলায়নী মনোবৃত্তির চর্চা, এটা সত্যের মখোমুখি না হওয়ার ইচ্ছা থেকে প্রসূত এক অদ্ভুত নির্লিপ্ত মানসিকতা। এর কারণ এমন এক ধরনের আতঙ্ক, দ্বিধা-সংশয় বা কুণ্ঠা যা অন্য কোন জাতির মধ্যে নেই। প্রচুর আত্মভিমান আছে অথচ আত্মবিশ্বাস একেবারেই নেই আমাদের মধ্যে, যার ফলে আমাদের দেশপ্রেম মজবুত নয়। জাতীয় স্বার্থেরব্যাপারে আমরা মোটেও সজাগ বা সচেতন নই। বিশ্বের সবচেয়ে অসতর্ক জাতি আমরা। এমনই আমাদের দৈন্যদশা হয়েছে যে আমরা আমাদেরই স্বদেশ এর পশ্চিমাংশকে পশ্চিম বাংলাদেশ বলতে ভয় পাই অথবা কুণ্ঠাবোধ করি কখনও পশ্চিমবঙ্গ কখনও পশ্চিমবাংলা ইত্যাদি বলে আমাদের সঙ্গে একটা কৃত্রিম পার্থক্য প্রকাশের চেষ্টা করি নিজেরই অজ্ঞাতসারে অবচেতন মনের উৎপ্রেরণায়। আদিকাল থেকে যা আমাদের পিতৃভূমি হিসাবে পরিচিত তাকে পররাজ্য আখ্যা দিয়ে নিজের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করছি আমরা। আসলে প্রথম থেকেই বিশ্বসমাজ যে ভুল করেছে, ভারতবর্ষকে মহাদেশ সংজ্ঞা না দিয়ে, তার ফলেই সকল জাতিগত সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

এতবড় একটা বহুজাতি অধ্যুষিত বিশাল ভূখন্ডকে শুধুমাত্র উপমাহাদেশ এর মর্যাদা দেয়া সমীচীন হয়নি। কেক কাটার মত কংগ্রেস ও লীগ দ্বিজাতিত্বের ভিত্তিতে অর্থাৎ ধর্মের ভিত্তিতে এই বিশাল ভূখন্ডকে দু'টুকরা করে ফেলে। বিশেষতঃ দুইটি রাজ্যের ক্ষেত্রে একই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠিকে দ্বিখন্ডিত করেছে - যেমন বাংলা ও পাঞ্জাব। তখনকার নেতৃত্ব জাতিসত্বার চেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিল সাম্প্রদায়িক সত্ত্বার উপর। মাথা মোটা লীগ ও কংগ্রেস নেতা সর্বনাশ করেছে একাধিক জাতিসত্ত্বার অস্তিত্বের ক্ষেত্রে যেমন বাংলা, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, তামিল, আসাম, সিন্ধু, মহীশুর, মাদ্রাজ, রাজস্থান, গুজরাট, মারাঠা ইত্যাদি প্রায় ১২টি পৃথক জাতিসত্ত্বার বিচিত্র বিকাশ ঘটতো ভারতবর্ষ নামক মহাদেশ সম বিশাল ভূখন্ডটির আওতায়। 'ওয়ান ন্যাশন থিওরী' তো কোনকালেই ভারতবর্ষে কার্যকর ছিল না, টু ন্যাশন থিওরীর অসারতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে - এ তত্ত্ব কোন আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মোগল আমলে, পাঠান আমলে কিংবা ইংরেজ আমলে, টু ন্যাশন থিওরীর কোন প্রয়োজনই হয়নি। কারণ মাল্টিন্যাশন থিওরীই কার্যত চালুছিল তখন। অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন জাতি মিলে শুধু ধর্মীয় ঐক্যের কারণে যেমন পাকিস্তানী জাতি হতে পারে না, তেমনি অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন জাতি মিলে শুধু ধর্মীয় ঐক্যের কারণে হিন্দুস্তানী জাতিও হতে পারে না। এ যেন পলিটিক্যাল প্লাস্টিক সার্জারী করে বিভিন্ন জাতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে পাকিস্তান আর হিন্দুস্তান এর দেহে সংযোজন করা হয়েছে কৃত্রিম অবয়ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আর এ কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো ভারতীয় ইউনিয়ন ও একদিন ভাঙতে শুরু করবে। এটাই ইতিহাসের অমোঘ নিয়তি, শুধু কিছু সময় অতিবাহনের অপেক্ষা। পূর্বহিমালয় অঞ্চল ত্রিপুরাসহ আসাম এর সাতবোন আজ অগ্নিবলয়ে পরিণত হয়েছে। জ্যোতিবসু পশ্চিমবাংলায় কিছুটা আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হলেও বাঙালী জাতীয়তার বিকাশে তার কোন অবদানই নেই। তিনি সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা হলেও তার ছেলে চন্দনবসু পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে বড় পুঁজিপতি। সংক্ষেপে বলতে গেলে পশ্চিমবাংলার বাম নেতৃত্ব অতি প্রগতিবাদী হয়েও দিল্লীর দাসত্ব করে যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলার আপামর জনতা একসময় দিল্লীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে, যদি তাদের মধ্যে সাফল্যের সাথে "বঙ্গবাদ" প্রচার করা যায়। তখন তারা মার্কসবাদী না হয়ে বঙ্গবাদী হওয়াকেই বেশি লাভজনক মনে করবে। প্যান জার্মানিজম এর মত প্যান বেঙ্গলিজম হবে আমাদের মূলমন্ত্র। একটি ঘুমন্ত জাতিকে জাগাবার আর কোন উপায় নেই। সর্ববঙ্গবাদ এর প্রচারে ও প্রসারে আমাদের কলম ও কণ্ঠ সমানে কাজ করে যাবে। সর্ববঙ্গবাদ কি তা সকলকেই বুঝতে হবে। বাঙ্গালীর "মহাজাতি তত্ত্ব" সকলকেই উপলব্ধি করতে হবে। বিশ্বের সকল বাঙালীর জন্য একজাতি তত্ত্বও সবাইকেই মানতে হবে।

'সকল বাঙালী একজাতি একদেশ' এই শ্লোগান এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে বৃহত্তর বাঙালী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, ২৪ কোটি বাঙালীর প্রকৃত মহাবাংলাদেশ গড়ার বিপ্লব। প্রাথমিক স্তরে এ আন্দোলন শান্তিপূর্ণ প্রচার এবং ভাষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ধীরে ধীরে তা সম্প্রসারিত হবে। বিদেশীদের বলতে হবে পশ্চিমবাংলা ত্যাগ করার জন্য অথবা বঙ্গবাদী হয়ে বাংলার সীমানার মধ্যেই স্থায়ীভাবে

বসবাস করার জন্য। অখন্ড ভারতবাদীরা শান্তিপূর্ণভাবে এ আহবানকে না মানলে অখন্ড বঙ্গবাদীদের সাথে তাদের সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে। ধীরে ধীরে সর্ববঙ্গবাদ ছড়িয়ে পড়বে সবখানে। এর সম্প্রসারণ মোটেই কঠিন কোন ব্যাপার নয়। শুধুমাত্র সফল প্রচার ও সুযোগ্য নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল। আমাদের অবশ্যই ফিরে পেতে হবে অতীতের গরীয়সী মহীয়সী বাংলাকে। বাঙালী জাতিয়তাবাদ এর আগুন দাবানলের মত জ্বলে উঠবে গোটা পশ্চিমবাংলায়।

আমাদের সমস্ত বিবর্তন এর ৪ (চার) টি প্রধান স্তর লক্ষ্যণীয়। প্রথম স্তরে সমগ্র বাংলার পরাধীন অবস্থা, দ্বিতীয় স্তরে আংশিক স্বাধীনতা, তৃতীয় স্তরে পশ্চিম ভুখন্ডসহ পূর্ণ স্বাধীনতা ও পূর্ণাঙ্গ বাঙালী জাতীয়তাবাদ এর পুনঃপ্রতিষ্ঠা. চতুর্থ স্তরে পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের সকল স্বাধীন রাজ্যমন্ডলীকে নিয়ে "বাংলা-আসাম কনফেডারেশন" গঠন। এসব কিছুই বিশ্লেষণের দাবী রাখে। কেননা এটা খুবই স্ববিরোধী ও অসঙ্গত মনে হবে যে. আমরা ইংরেজী আমলে পরাধীন থাকাকালীন ঐক্যবদ্ধ দেশ হিসাবে ছিলাম অথচ ১৯৪৭ এ স্বাধীন হবার পর দ্বিখন্ডিত হয়ে গেলাম। তাহলে কি পরাধীনতা ঐক্যের সহায়ক আর স্বাধীনতা অনৈক্যের? এটা কিছুতেই হতে পারে না। আসলে আমাদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা স্বাধীনতার নামে নব্য উপনিবেশবাদ কায়েম। তথাকথিত স্বাধীনতা দেয়ার সাথে সাথেই বাঙালীর স্বাভাবিক জাতি পরিচয়ের পারিবর্তন ঘটানো হয়েছে অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে। বৃটিশ উপনিবেশ চলে গেলো কিন্তু বাংলার উভয়খন্ডে তৈরী হলো নতুন দুই উপনিবেশ একটা করাচী কেন্দ্রীক আরেকটা দিল্লী কেন্দ্রীক। আমরা বাঙালী পরিচয় বিসর্জন দিয়ে আত্মঘাতী কর্মতৎপরতায় মেতে উঠে পাকিস্তানী ও হিন্দুস্তানী পরিচয় বরণ করেছিলাম - যার ফলে একবাংলা দুইবাংলা হলো মুসলমান হিন্দু বাঙালী উভয়ই দুইটি নতুন কৃত্রিম জাতীয়তাবাদ এর ভগ্নাংশে পরিণত হওয়াকেই শ্রেয় মনে করেছিলাম। সকল বাঙালীর জন্য একটি স্বতন্ত্র বাসভূমি দাবী না করে মুসলমান এর জন্য একটি এবং হিন্দুর জন্য আরেকটি স্বতন্ত্র বাসভূমি প্রতিষ্ঠা করতে রাজি হয়েছিলাম । সেটা ছিল ভুল - শুধু ভুল নয় হিমালয়সম ভুল। বাঙালীর অকৃত্রিম মহাজাতি সত্ত্বাকে কবর দিলাম নিজেরই অজান্তে- কিসের আকর্ষণে ? দুইটি ধর্মভিত্তিক কৃত্রিম জাতীয়তার আকর্ষণে। আমাদের সাময়িক উত্তেজনা ও সস্তা আবেগের ফসল সে স্বপ্ন কি সফল হয়েছে? সে স্বপ্ন যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, তার ঋণ ঢাকার লোকেরা লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে পরিশোধ করেছে। কলিকাতার লোকেরা কি বলবে? সে স্বপ্ন সার্থক হয়েছে ? মোটেই না। "না পারি কইতে না পারি সইতে" - এমন অবস্থা আজ পশ্চিমবাংলাবাসীদের। সাধারণ মানুষ অদূরদর্শী স্বার্থান্বেষী নেতাদের তৈরী করা দূর্ভাগ্যের শিকার হয়েছিল সেই সময়।

এখন পশ্চিমবাংলার যেসব নিস্প্রাণ বুদ্ধিজীবীরা এপার বাংলা - ওপার বাংলা বলে আবেগ ছড়াতে চান তাদের অনেকেই প্রচ্ছন্নভাবে আশা করেন বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে ওপার বাংলার সাথে যুক্ত হবে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত রাষ্ট্র হিসাবে - যা কখনই সম্ভব বা কাম্য নয়। বরং তার উল্টোটাই সম্ভব ও বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ বাংলাদেশ এর সাথে যুক্ত হবার লক্ষ্যে পশ্চিমবাংলাকেই প্রথমে বিযুক্ত হতে হবে ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে।

আসলে ১৯৪৬–৪৭ সময়টাতে মারামারি করেছিল কারা? কোন কোন বিশেষ অঞ্চলের বাঙালীরা? তারা সংখ্যায় কত? তারা কি গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ ? কলিকাতা এবং নোয়াখালী অঞ্চলের লোকেরা দাঙ্গা বাঁধিয়েছিল। তাদের জন্য গোটা বাংলার সকল বাঙালীকে মূল্য দিতে হবে কেন ? তাছাড়া এই দুইটি মাত্র অঞ্চলের সকল বাঙালীতো আর দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করেনি – শুধু গুন্ডা প্রকৃতির দাঙ্গাবাজ লোকেরা সংখ্যায় কম হয়েও ব্যাপকতম সর্বনাশ করেছিল গোটা বাঙালী জাতির। কাজেই দেখা যায়, কলিকাতা ও নোয়াখালী অঞ্চলের কিছু সন্ত্রাসী সারাবাংলার রাজনৈতিক ভাগ্য বিধাতা বনে গেল; অন্তত সেই সময়ের জন্য ? বাংলার আকাশে তখন যে ঘন তমসার সৃষ্টি হয়েছিল তা কি গুটি কয়েক অবাঙালী হিন্দু মুসলিম নেতার দুরভিসন্ধিমূলক সিদ্ধান্তের ফলে হয়নি ? হঠাৎ করে মুসলিম লীগ এর 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' আহবান করা এবং ততোধিক দ্রুতগতিতে কংগ্রেস এর তা প্রতিরোধ করার পদক্ষেপ নেয়া, এসবই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য সরাসরিভাবে সহায়ক হয়েছিল। পলাশীর রণক্ষেত্রে তত বাঙালী মরেনি যত বাঙালী কলিকাতার দাঙ্গায় মরেছে।

বর্তমান বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের লেখায় গণমানসে কোন আবেগ সৃষ্টি হয় না। কেননা তারা তাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন না অথবা সত্য প্রকাশে কুণ্ঠিত, ভীত এবং দ্বিধাগ্রস্ত। বাংলার ইতিহাস সে কারণে সুলিখিত নয়, সত্য–নিষ্ঠা ও স্বজাতি প্রেমের অভাবে।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও তৎপরবর্তী কলিকাতা ও নোয়াখালীর দুঃখজনক ঘটনাবলীর কোন বিকল্প ছিল কিনা সে সম্পর্কে এই প্রজন্মের যে কেউ প্রশ্ন রাখতে পারে। হ্যাঁ বিকল্প অবশ্যই ছিল। এর বিকল্প হতে পারতো ধৈর্য্য ধরে শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের একটা উন্মুক্ত পরিবেশ তৈরী করা। আরো কিছু সময় অপেক্ষা করে ক্যাবিনেট মিশন পরিবল্পনা গ্রহণ করার জন্য সকলকে বুঝানো এবং কংগ্রেস এর ভেতরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই নেহেরু বিরোধী জোট গড়ে তোলা উচিত ছিল। বাংলার অখন্ডতার প্রধান বিরোধী শক্তি নেহেরু প্যাটেলের স্বরূপ উন্মোচিত করে নেহেরুকে কংগ্রেস এর সভাপতির পদ থেকে অপসারণ করার চেষ্টা হাতে নেয়ার দরকার ছিল। আর মুসলিম লীগের উচিত ছিল সংগঠনের সকল সিদ্ধান্তের ক্ষমতা একা মিঃ জিন্নাহর হাতে না ছেড়ে কেন্দ্রীয় কমিটির পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভারত–বিভাগ এর মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে ধীরে সুস্থে (এর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাসহ) চুল চেরা বিশ্লেষণ করা। তখনকার ঘটনা প্রবাহ থেকে যে কোন তৃতীয় পক্ষের মনে হবে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যেন উন্মত্ত অধীর হয়ে গিয়েছিল কত তাড়াতাড়ি মহাদেশতুল্য বিশাল ভারতকে দু টুকরো করা যায় – যার ফলে কোন সুস্থ পরিবল্পনা ছাড়া একই ভাষাভাষী, একই জাতি বাংলা ও পাঞ্জাবকেও দু টুকরা করে ফেলা হয় – পরবর্তীতে যার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত অশুভ হয়ে দেখা দেয়।

যদি ভারতবর্ষীয় পাঁচমিশালী জাতিকে অর্থাৎ ইন্ডিয়ানদেরকে সম্মিলিতভাবে একজাতি

ধরি তাহলে আমরা বাঙালীরা সংখ্যার ভিত্তিতে তাদের চেয়ে ছোট হবো অর্থাৎ আমরা হবো বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম জাতি। কিন্তু ভারত তো বহুজাতিক রাষ্ট্র। তার জাতীয়তা হচ্ছে বহু জাতির ভেজাল মিশ্রণ। কাজেই বাঙালীরাই আসলে দ্বিতীয় বৃহত্তম নির্ভেজাল জাতি – ভারত দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র (জাতি নয়) পাকিস্তানীরাও নির্ভেজাল এক জাতি নয়; তারা পাঁচ জাতি মিলিত রাষ্ট্র।

প্রাচীন বাংলার আকার যে কত বিশাল ছিল তা টলেমীর ভৌগোলিক বিবরণ হতে জানা যায়। উত্তরে হিমালয় পাদদেশ থেকে শুরু করে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এর সীমানা ছিল। পশ্চিমে দ্বারভাঙ্গা থেকে শুরু করে পূর্বের আকিয়াব পর্যন্ত এর সীমানা ছিল। আজকের পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, আসামের কাছাড়, গোয়ালপাড়া এবং বিহার এর পূর্ণিয়া, মানভূম, সিংভূম ও সাঁওতাল পরগনা বাংলার অন্তর্ভূক্ত ছিল। রাঢ়ভূম বলতে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও ধূলভূমকে বোঝাতো। পূর্ববঙ্গকে তখন বাঙ্গালদেশ বলে উল্লেখ করা হতো। রাময়ন এবং মাহাভারতেও এই বিশাল বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। পাঞ্জাবকে পাঞ্জাব প্রদেশ বলা হতো কিন্তু বঙ্গকে বঙ্গ প্রদেশ বলা হতো না, তাকে বলা হতো বঙ্গদেশ।

নিকট অতীতেও পশ্চিমবাংলার সুশিক্ষিত লোকেরা অবজ্ঞা করে যাদেরকে ভাটির দেশের বাঙাল বলে ডাকতো তারাই এখন রাজনৈতিকভাবে ধরতে গেলে গোটা পশ্চিমবাংলাই শাসন করছে। জ্যোতিবসু থেকে শুরু করে কনিষ্ঠতম মন্ত্রীটি পর্যন্ত ৭৫% ভাগ কেবিনেট সদস্যই জন্মসূত্রে বাংলাদেশ ভূখন্ডের লোক। এরাই ১৯৪৭ এর আগে পরে প্রিয় জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে নতুন হিন্দুস্তানী জাতিসত্ত্বার ব্যর্থ সন্ধানে পাড়ি জমিয়েছিলেন ওপার বাংলায়। ওটা ছিল নব্য ভারতীয় জাতীয়তার মরিচীকা। একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, বর্তমান পশ্চিমবাংলার নেতা ও শাসকদের বার আনাই বাঙ্গাল। মার্জিত বাঙ্গালদের গায়ে কাদামাটির প্রলেপ লাগানো আজ ইতিহাস এর প্রয়োজন। তবেই বাঙালীর শ্বাশ্বতকালের মিলনের মহাসাধনা সার্থক হতে পারে। একথা বুঝতে হবে, বাঙালী জাতীয়তাবাদ এর সম্প্রসারণ মানেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এর সংকোচন। একটা আরেকটার প্রতিমুখী অবস্থানে দাঁড়িয়েছে। বাঙালীর হুজুগ আর চীনের হেকমত এ দুটোকে কাজে লাগাতে পারলে আমরা বঙ্গবাদ এর পূর্ণতম সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হবো। কারণ অখন্ড বঙ্গবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে অখন্ড ভারতবাদকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। সে চ্যালেঞ্জ সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পথে করা যাবে না এবং একাও করা সম্ভব হবে না; প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাহায্য, সহোযোগিতা অবশ্যই চাইতে হবে। বঙ্গীয় একত্রীকরণ বা পুনর্মিলন প্রক্রিয়ায় ভারত খন্ডন বা হিন্দুস্তান ভাঙ্গা (পাকিস্তান ভাঙ্গার মতই) একটি অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণতি হিসেবে দেখা দেবে। যত তিক্ত, যত বিপদসংকুল বা যত ভয়াবহই হোক না কেন বাঙ্গালীকে সেই সত্যের মুখোমুখী হতে হবে তার নিজেরই বৃহত্তর অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে ও তাগিদে। নতুবা তাকে তিলে তিলে নিঃশেষিত হয়ে যাবার নিয়তিকে মেনে নিতে হবে। পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা আর আসাম এর মুক্তি আন্দোলনে আমাদেরকেই প্রধান সাহায্যকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে কারণ মূল

বাংলাদেশকে আমরা অতীতের হিসেবে দেখতে চাই। ঐতিহাসিক বাংলাদেশ বলতে আমি সিরাজ-উদ-দৌলার সেই গরীয়সী মহীয়সী বাংলাকে বুঝাচ্ছি, যার সীমানার মধ্যে ছিল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা, আরাকান ইত্যাদি।

প্রাচীন বাংলার খন্ডিত অংশকে সোনারবাংলা নাম দিয়ে আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করার চেষ্টা করছি। ভুল নেতৃত্ব, ভুল সিদ্ধান্ত এবং জাতীয় গৌরব সম্পর্কে উদাসীনতাও নির্লিপ্ততা যুগে যুগে বঙ্গচিত্রকে ব্যাঙ্গচিত্রে পরিণত করেছে। আমরা ভুলেই গেছি যে, আমাদের ঘরের দুয়ারে পশ্চিম বাংলাদেশ, আমার জানালার ডান পাশে কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং আমার পেছনের আঙিনায় আছে ত্রিপুরা, আসাম আর আরাকান। এসবই বঙ্গবলয় এর রাজ্যমালা যা হিন্দি বলয়ের প্রতিমুখী অবস্থানে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে প্রতিপক্ষ হিসেবে। একটা আরেকটার প্রতিদ্বন্দ্বী। আমাদের গন্তব্যস্থল হচ্ছে দ্বারভাঙ্গা বা দ্বারবঙ্গ। যত দ্রুত আমরা লক্ষ্যস্থলে পৌছতে পারি ততই মঙ্গল। সেখান থেকেই শুরু হবে মহাবাংলার মহামিলন এর উৎসব।

"বঙ্গদেশের" নামটি সুদুর অতীত থেকে স্বাধীন "বঙ্গদেশের" অস্তিত্বকেই প্রতীকায়িত করে মাত্র। ভারতবর্ষের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত সেই অখন্ড বঙ্গদেশ এর পুনঃপ্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য। যদি অতীতে বঙ্গদেশ ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন না থাকতো তাহলে বঙ্গ উপসাগর না হয়ে এটা হতো ভারত - উপসাগর অর্থাৎ 'বে অব বেঙ্গল' না হয়ে 'বে অব ইন্ডিয়া' হতো।

ভারতবর্ষের মহাদেশতুল্য বিশালতা ও বর্ণবৈচিত্র্য ইংরেজ এর কাছে অসহনীয় ছিল। তাই তারা এটাকে কন্টিনেন্ট নাম না দিয়ে সাবকন্টিনেন্ট নাম দিয়েছে। কারণ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ অতি ক্ষুদ্র এক ভুখন্ড যার মধ্যে আবার আইরিশ আর স্কটিশরাও বাস করে ভিন্নভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে। তারপরও ঐ দ্বীপপুঞ্জের নাম হয় 'ইউনাইটেড কিংডম অব গ্রেট ব্রিটেন' অথচ একই ভাষা সংস্কৃতি হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ, পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা, আসাম মিলে 'ইউনাইটেড স্টেটস অব গ্রেট বেঙ্গল' হতে পারেনি। এটা এক বেদনাদায়ক ব্যর্থতা। আমরা স্বজাতির সাথে 'ডিভাইডেড কিংডম' গড়লাম ১৯৪৭ এ। মাতৃভূমি ও মাতৃজাতির সাথে এটা ছিল চরম বিশ্বাসঘাতকতা যা নেতারা করেছিলেন। সুদূর অতীত থেকে একটা পৃথক বাসভূমির অস্তিত্ব ভোগ করে আসছিল গোটা বাঙালী জাতি।

রাজনৈতিক দর্শন বা আদর্শ না থাকলে যে কোন জাতির ভাগ্যে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। ১৯১১ সনে বাঙালী জাতি একতাবদ্ধ হয়েছিল, ১৯৭১ সনেও পশ্চিমবাংলার লোকের জন্য একটা সুযোগ এসেছিল - কিন্তু তারা সে সুযোগ কাজে লাগায়নি আত্ম-পরিচয় সংক্রান্ত বিভ্রান্তির কারণে। দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রেতাত্মারা তখনও তাদের কাঁধের উপর ভর করেছিল। ১৯৪৭এ একজন মুসলমান বাঙালী (স্বজাতি হয়েও) একজন হিন্দু অবাঙালীর তুলনায় পশ্চিমবাংলার লোকদের কাছে বেশি আপন হতে পারেনি। অর্থাৎ একজন অবাঙালীও

তাঁদের কাছে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার কারণে। ১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ববাংলায়ও এটা ঘটেছিল – অর্থাৎ একজন অবাঙালীও তাদের কাছে বেশি আপন হয়ে উঠেছিল শুধু মুসলমান হওয়ার কারণে (পশ্চিম বাংলাবাসী কোন হিন্দুর তুলনায়)। পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে এ দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এর পর থেকেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় পশ্চিমবাংলায় এ ধরনের সুস্পষ্ট স্বাজাত্যবোধের বা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এর কোন উপলব্ধি তখনও আসেনি। এ ব্যাপারে তারা আমাদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। এর একটা কারণ, পশ্চিমবাংলার সাথে বাকি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সংযোগ ও নৈকট্য। তবে এর জন্য পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত প্রাণহীন বুদ্ধিজীবীরাও কম দায়ী নয়। প্রাণহীন বুদ্ধিজীবীর তুলনায় প্রাণবন্ত মূর্খ ও যে ভাল তা আগামীদিনের ইতিহাসই প্রমাণ করবে। মুসলমানের জন্য পৃথক বাসভূমি দাবী না করে কিংবা হিন্দুর জন্য পৃথক বাসভূমি দাবী না করে সকল বাঙালীর জন্য একটি পৃথক বাসভূমি দাবী করা উচিত ছিল তৎকালীন নেতাদের। একটা ব্যাপারে খুবই বৈসাদৃশ্য, অসামঞ্জস্য বা বৈপরিত্য লক্ষ্য করা যায়। আমাদের নেতাদের অনেকের মধ্যেই, যাদের পান্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তা আছে, তাদের মধ্যে আবার সংগ্রামী চেতনার সমান্তরাল অস্তিত্ব নেই। আবার যাদের মধ্যে প্রচন্ড দুঃসাহস, বলিষ্ঠতা ও সংগ্রামী চেতনা আছে তাদের মধ্যে আবার সমানুপাতিক পান্ডিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা নেই। সংগ্রামী চেতনার সাথে সমান্তরাল বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনার সমন্বয় ঘটাতে পারলেই মহান নেতৃত্বের বিকাশের সাধনা সফল হবে। অদূর ভবিষ্যতেই এ ধরনের ঘটনা ঘটবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

একটি 'সজাগ বাংলা' গড়ার আন্দোলন করতে হবে। তার পূর্বে আমাদের অবশ্যই আবিস্কার করতে হবে আমাদের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষ নেতৃত্বে ঘাটতি কোথায় ? আমাদের এক নম্বর আগ্রাধিকার হবে সর্ববঙ্গবাদী জাতীয়তাবাদ বা প্যান বেঙ্গলিজম বা সংক্ষেপে 'বঙ্গবাদ'। একজন বঙ্গবাদীর কি আদর্শ হবে তার চলার পথ কি হবে তার নিত্যদিনের সাধনা ও অনুশীলন কি হবে তার নির্দেশনা আসবে সর্ববঙ্গবাদ এর প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের কাছ থেকে। ধীরে ধীরে বাঙালীর আত্মবিকাশ ঘটবে এশিয়ার তথা সারাবিশ্বের এক মহাজাতি হিসাবে যা চীনাদের পরই দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি হবে। এক ভাষার বন্ধনে বাঁধা এক অবিমিশ্র নির্ভেজাল জাতি যেমন চীন, জাপান, জার্মান, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, তুরস্ক, মিশর ইত্যাদি। একটা কথা সকলকে উপলব্ধি করতে হবে। 'বঙ্গবাদ' এর কোন বিরোধ নেই ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ বা খৃষ্টান ধর্মের সাথে। একজন বঙ্গবাদী একজন খাঁটি ধার্মিক হতে পারেন কিন্তু কোন অবস্থাতেই ধর্মবিদ্বেষী বা সাম্প্রদায়িক হবেন না। পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা হবে বঙ্গবাদীর মূলতন্ত্র। একজন বঙ্গবাদী ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা গনতন্ত্রের পুজারী হতে পারেন, কোন বাধা নেই। বঙ্গবাদীদের পারস্পারিক সম্পর্কের একটাই সাধারণ ভিত্তি, আর তাহলো নির্ভেজাল বাঙালী জাতীয়তাবাদ। ধর্মীয় ভিন্নতা এ জাতীয়তাকে খন্ড-বিখন্ড করতে পারবে না। সকল বাঙালীর সাধারণ সেতুবন্ধন হলো 'বঙ্গবাদ'। বঙ্গবাদ সঠিক পথনির্দেশনা দেবে এবং অচিরেই মহান বাংলা গড়তে সাহায্য করবে।

বৃহত্তর বাংলা ও বৃহত্তর আসাম এর পুনর্গঠন (বা পুর্নবিকাশ) একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজন ও বাস্তবতারই প্রতিফলন বলে গণ্য হবে। বিশ্বসমাজ জানে অতীতের বাংলা ও এক আসাম এর অস্তিত্বের কথা। বরং আসম ছিল বাংলারই পার্বত্য অঞ্চল বা অসম অঞ্চল (অসমান এলাকা) – আজকের বাংলা তিন খন্ডে খন্ডিত – পশ্চিমবাংলা, বাংলাদেশ আর ত্রিপুরা। আমরা যেভাবে পাকিস্তানীদের দাসত্বশৃঙ্খল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করেছি ঠিক একইভাবে পশ্চিমবাংলার বাঙালীদেরকেও মুক্ত হতে হবে হিন্দুস্তানীদের দাসত্ব শৃংখল থেকে। তাদের মুক্তি সংগ্রাম যদি শুরু হয় তখন অবশ্য তাদেরকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে হবে। অর্থ, জনশক্তি, খাদ্য, আশ্রয়, অস্ত্র, ট্রেনিং ইত্যাদি সবকিছু দিয়ে সাহায্য করতে হবে। পশ্চিম বাংলা বাংলারই পশ্চিম অঞ্চল বৈ কিছুই নয়। বিদেশীদেরকে বিশেষভাবে বুঝাতে হবে সত্যিকার 'মাদার বেঙ্গল' এর আকার কত বড়। বাঙালী যে আসলেই এক মহাজাতি তার আবাস ভূমির প্রাচীন মানচিত্র দেখলেই বুঝা যায়। পশ্চিমের দ্বারভাঙ্গা থেকে পূর্বের আকিয়াব পর্যন্ত এক বিশাল ভূখন্ডের অধিকারী আগামীদিনের বৃহত্তর বাংলা যা মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও (১৯৪৭ পর্যন্ত) বৃহত্তর বাংলা হিসেবেই বিরাজিত ছিল। আমার একটা প্রশ্ন, মাত্র পঞ্চাশ বছরের বিচ্ছিন্নতা কি তিন হাজার বছরের ঐক্যের ইতিহাসকে অস্বীকার করতে পারে ? দুই বাংলার মানুষকেই এখন ভাবতে হবে কিভাবে শান্তিপূর্ণ প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বঙ্গবাদ প্রসারিত হবে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বঙ্গবাদকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় প্রচার এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে বঙ্গবাদ প্রসারিত হবে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, শান্তিপূর্ণ প্রচার ও আন্দোলন এর পথ বেছে না নিলে বিবর্তন এর পরিবর্তে বিপ্লব এসে যাবে অনিবার্যভাবে – যা সংঘাত ও সন্ত্রাসের জন্ম দিতে পারে। কিন্তু আমরা চাই সত্যিকার জ্ঞান ও ধ্যান–ধারণার উপর ভিত্তিশীল এক আদর্শ মতবাদ সত্যের মর্যাদাসহ প্রচারিত ও প্রসারিত হোক শান্তিময় বিবর্তন এর মধ্য দিয়ে এবং এই মতবাদ তথা বঙ্গবাদ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনমত যাচাই এর মধ্য দিয়েও গৃহীত হতে পারে পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরা রাজ্যে। দিল্লী যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এর মতামতকে প্রত্যাখ্যান করে তখন সেক্ষেত্রে সর্বাত্মক সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে উঠবে – আন্দোলন বিবর্তন এর ভূমিকা থেকে সরে গিয়ে বিপ্লব এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। তখন বঙ্গসঙ্গীত এর সুরের আগুন সবার প্রাণে লাগবে এবং তা ছড়িয়ে যাবে সবখানে। তখন বাংলাদেশ এর বাঙালী আর পশ্চিমবাংলার বাঙালীর মধ্যে কোন তফাৎ থাকবে না – সবাই একদেহে হবে লীন। তখন কবিগুরুর অনুভূতির সাথে একাত্ম হবে জননী জন্মভূমি সম্পর্কে সকল বাঙালীর অনুভূতি ঃ–

"নমো নমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি
গঙ্গারতীর, স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।"

পশ্চিমবাংলার তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তাদের পূর্ব সীমানার স্বজাতিদের বলে "বাঙ্গাল" আর পশ্চিম এর বিজাতিদের বলে " মেড়ো"। কিন্তু তাদের ভাগ্যের কি পরিহাস যে তারা রাজনৈতিকভাবে শাসিত হচ্ছেন বাঙালদের দ্বারা এবং অর্থনৈতিকভবে মেড়োদের দ্বারা। যে সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন বঙ্গবাদী হবে না তাদের বয়কট করতে হবে সকল

বাঙালীকে।

২০০১ সালের অর্থাৎ ২১ শতকের প্রথম ২১ শে ফেব্রুয়ারী থেকে মহাজাতি বাঙালীর নবজাগরন বা গ্রেট রেঁনেসা শুরু হবে বলে আমার বিশ্বাস। অন্ততঃ সেটাই আমাদের নিকটতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। আগামী শতাব্দী হবে বৃহত্তর বাংলা গঠনের শতাব্দী। পশ্চিমবাংলায় অবিলম্বে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা এই মুর্হুতের প্রয়োজন।

আসন্ন রেঁনেসা এই মহাজাতির নবজন্ম নয় বরং পুনর্জন্ম। কেননা এই বিশাল জাতির জন্ম হয়েছিল কয়েক হাজার বছর আগে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সে স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে অখন্ড বৃহত্তর বাংলা রূপেই বিরাজিত ছিল। এখন যদি খন্ডিত দেশটি আবার জোড়া লাগে তবে তা হবে দ্বিতীয়বারের মত দুই বাংলার পুনর্মিলন। প্রথমবার পুনর্মিলিত হয়েছিল ১৯১১ সালে। প্রথম আংশিক পুনর্জন্ম হয় ১৯৭১ সালে। দ্বিতীয় পুনর্জন্ম ২১ দশকের প্রথম দশকেই হবে বলে আমার বিশ্বাস। সেই মহামিলনের পথ চেয়ে বসে থাকবো আমরা সকলে। অবশ্য বাঙালীর ভাষাভিত্তিক রেঁনেসা বা নবজাগরণ শুরু হয়েছে ১৯৫২ সাল থেকে। সেই মহান রেঁনেসার সূতিকাগার ছিল ঢাকা। আগামীশতক এর বাংলা রেঁনেসার সূতিকাগার হবে কলিকাতা- এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পশ্চিমবাংলার চূড়ান্ত মুক্তি আন্দোলন এর পূর্ব পর্যায়ে সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক সংগ্রাম চলবে পশ্চিমা হিন্দি কালচার এর বিরুদ্ধে। এই "সাংস্কৃতিক যুদ্ধ" ঘোষণা করার উপযুক্ত সময় এখনই। বাঙালী জাতির পূর্ণ অস্তিত্ব রক্ষার আর কোন পথ নেই। সম্পূর্ণ বঙ্গবৃত্ত এই সাংস্কৃতিক উত্থানে আন্দোলিত হবে। সৌরবলয়ের মধ্যে যেমন, পৃথিবী, চন্দ্র ও মঙ্গলগ্রহ রয়েছে তেমনি বঙ্গবলয়ে রয়েছে পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা ও আসাম। তারা বঙ্গসূর্যের চারপাশেই পাক খাচ্ছে। কিন্তু মূল বাংলাদেশ এর কক্ষপথ থেকে তারা এখনও অনেক দূরে, ভারতীয় কক্ষপথে ভেসে বেড়াচ্ছে।

আমরা যদি ছোট বাংলা গড়ার স্বার্থে পাকিস্তান ছাড়তে পারি তবে পশ্চিমবাংলার মানুষকেও বড় বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য, শুধু পাকিস্তান ভাঙ্গলেই চলবে না, হিন্দুস্তানকেও ভাঙ্গতে হবে। এ দায়িত্ব প্রধানত পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা আর আসাম এর মানুষের উপর বর্তায়। এই বাংলারও দায়িত্ব আছে। কারণ সুপ্রাচীন কাল থেকেই পশ্চিমাবাংলা, ত্রিপুরা আসাম অঞ্চল আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা অবশ্যই আমাদের পুরাতন ভূখন্ডটিকে ফিরে পেতে চাই। এতে দিল্লী আমাদের শত্রু হবে। আমরা গোটা বাঙ্গালী জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে দিল্লীর মোকাবিলা করতে পারবো। জাতিসংঘ এবং বিশ্বসমাজ আমাদের পক্ষে থাকবে। কেননা আমরা পূর্ণাঙ্গ জাতীয়তা, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিষ্ঠা করতে চাই। সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামে বিশ্বস্রষ্ঠার সাহায্য যেমন আমাদের কাছে আসবে তেমনি সারাবিশ্বের কোটি কোটি স্বাধীনতাকামী মানুষের অকুণ্ঠ সর্মথন পাব।

বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস যতই পড়ি ততই মনে হয় এ ইতিহাস অস্পষ্টতার

ইতিহাস। কেবলই দ্বিধাসংশয়, কেবলই কুণ্ঠা আর জড়তা। আমরা যেন আমাদের জাতির বোঝাটুকু বইতেও অক্ষম ছিলাম। "ওরে ভীরু, তোর হাতে নেই ভূবনের ভার" – কবির এই খেদোক্তি বাঙালীর জন্য খাটে। বাঙালী হিন্দু ইতিহাসবিদ ও লেখকদের লেখায় কেবলই ঘোর প্যাঁচ, দিল্লীতোষণ নীতির প্রতিফলন। বঙ্গায়ন প্রক্রিয়া না ভারতায়ন প্রক্রিয়া, অখন্ড বঙ্গবাদী না অখন্ড ভারতবাদী কোন্‌টি তাদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হলে তারা এসবকে এড়িয়ে যান। এ ধরনের মৌলিক প্রশ্নে তাদের মতামত অস্পষ্ট, দ্বিধাগ্রস্ত আর সংশয়াচ্ছন্ন। এমন কি সমাজবাদী জ্যোতিবসুর নেতৃত্বে মহাজাতি বাঙালীর এক বিরাট অংশ আজ ভারতীয় জাতীয়তার জোয়াল বয়ে বেড়াচ্ছে।

পশ্চিমবাংলার মানুষ আজ অসহায়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এর অক্টোপাস তার আট বাহু প্রসারিত করে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে পশ্চিমবাংলাকে। ত্রিপুরা আর আসাম এর অবস্থা তুলনামুলকভাবে একটু ভাল, কেননা সেখানে ইতিমধ্যেই মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে – যার ঢেউ পশ্চিমবাংলায়ও লাগবে।

আমার ধারণা একুশ শতকের প্রথম প্রহরেই পশ্চিমবাংলায় মুক্তি আন্দোলনের শুভ সূচনা হবে। পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের সম্পূর্ণ ভূখন্ড যেদিন মুক্ত হবে সেদিন তথাকথিত বহুজাতিভিত্তিক ভারতীয় জাতীয়তার মৃত্যুঘন্টা বাজবে। এর পরবর্তী পর্যায়ে মুক্ত রাজ্যগুলোকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ এর সাথে কনফেডারেশন গঠন এর আমন্ত্রণ জানানো যাবে। কেবিনেট মিশন প্ল্যানে প্রস্তাবিত কেন্দ্রের মতো একটি কেন্দ্র থাকবে ঢাকায় – যার মধ্যে পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ ছাড়া আর কোন বিষয় থাকবে না। কনফেডারেশনভূক্ত রাজ্যগুলো যদি অর্থ কিংবা অন্য কোন বিষয় কেন্দ্রের কাছে ছাড়তে রাজি হয় তাহলে আলাদা কথা। বাংলা কনফেডারেশন এমন একটি আদর্শ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করবে যা সর্ববঙ্গীয় ঐক্যের স্বার্থে সর্বোত্তম বলে বিবেচিত হবে। সর্ব ভারতীয় ঐক্যের স্বার্থে – যা কেবিনেট মিশন করতে ব্যর্থ হয় জওহেরলাল নেহরুর দূরভিসিন্ধিতেও প্যাটেল এর চক্রান্তে। বাংলা আসাম মিলে একটি গ্রুপ তৈরী করলে এবং তা সার্বভৌম স্বাধীন হলে বলা যাবে কেবিনেট মিশন প্ল্যানই পুনর্জীবিত হয়েছে এ অঞ্চলের জন্য। মূলতঃ বিভিন্ন রাজ্যের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থান এর ভিত্তিতে রাজ্যগুলোর গ্রুপিং করেছিলেন কেবিনেট মিশন প্ল্যান এর উদ্যোক্তারা। পূর্বাঞ্চলীয় গ্রুপিং এতো বাস্তবভিত্তিক হয়েছিল যে বাংলা–আসাম একই রাষ্ট্র রূপে জন্ম নিত। কাঁচামাল পূর্ববাংলায়, কলকারখানা পশ্চিমবাংলায় আর খনিজসম্পদ আসামে রেখে রেডক্লিফের ছুড়ি দুই বাংলাকে কেটে দিল, আসামকেও বিচ্ছিন্ন করলো। যার প্রতিক্রিয়ায় বাংলা আসাম অঞ্চলে অর্থনৈতিক স্থবিরতা দেখা দেয়। প্রথমদিকে পূর্ববাংলার কাঁচামাল অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে থাকতো আর কলিকাতার কলকারখানাগুলো অচল হয়ে পড়ে থাকতো কাঁচামালের অভাবে। আসাম এর তেল, সিমেন্ট, চুনাপাথর সরাসরি দিল্লী আর বোম্বেতে নিয়ে যাওয়া হয়। পূর্ববাংলার কাঁচামাল করাচীর দিকে যাত্রা করলো জাহাজ ভরে আর পশ্চিম ভারতের কাঁচামাল চড়াদামে কিনতে হলো পশ্চিমবাংলাকে। আসাম এর

উৎপাদিত পেট্রোল বাংলার সম্পদ না হয়ে দিল্লীর সম্পদ হয়ে গেল। ভারতের মোট জাতীয় পেট্রোল উৎপাদনের ৯০% ভাগ আসামের অবদান।

দেশবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধু পর্যন্ত সুদীর্ঘ ইতিহাস এর ধারায় আমরা পাই বাংলার বীর ফজলুল হককে, পাই বাংলার সিংহ সুভাষ বসুকে, পাই শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশেম আর শরতবসুকে। কিন্তু তবুও বাংলার অখন্ডতাকে রক্ষা করা গেল না, শুধু সর্বভারতীয় অবাঙালী নেতা ও ব্রিটিশদের চক্রান্তের কারণে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯০৬ সনে পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগ এবং পশ্চিমবাংলায় হিন্দু মহাসভা গঠিত হয় ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ মদদে। ইংরেজদের পরোক্ষ প্ররোচনা এ দুইটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন এর জন্ম দেয়। এরই ফলশ্রুতিতে দেখা যায়যে, ১৯৪৭ সনে বাঙালীরাই পূর্ববাংলায় পাকিস্তান এবং পশ্চিমবাংলায় হিন্দুস্তান প্রতিষ্ঠা করে। গোটা বাংলায় "বাঙালীস্তান" প্রতিষ্ঠার বিষয়টি দুপক্ষই ভুলে গেল।

অদ্ভুত স্ববিরোধিতা লক্ষ্যণীয়। একজন পূর্ববাঙ্গালীর সভাপতিত্বে মুসলীম লীগ ও পাকিস্তান এর জন্ম হয়। যার নাম নবাব সলিমউল্লাহ। অপরপক্ষে একজন পশ্চিমবাঙালীর সভাপতিত্বে কংগ্রেস এর জন্ম তথা হিন্দুস্তান এর জন্ম হয়। তিনি হলেন কলিকাতার উমেশ চন্দ্র বানার্জী (লর্ড হিউমের ব্যাক্তিগত বন্ধু) তাহলে দেখা যাচ্ছে বাঙালীরাই জন্ম দিয়েছে অদ্ভুত গোঁজামিল-যুক্ত সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তানের এবং আরো অদ্ভুত ভেজাল অস্তিত্বের বহুজাতিক রাষ্ট্র হিন্দুস্তানের। দুইটি নবসৃষ্ট রাষ্ট্রই বহুভাষা, বহুবর্ণ ও বহু সংস্কৃতির কৃত্রিম মিশ্রণ। গোখ্‌লে বলেছিলেন "বাংলা আজ যা ভাবে হিন্দুস্তান তা ভাববে আগামীকাল।"

সত্যিই ভারতবর্ষীয় অবাঙ্গালী মুসলিম ও হিন্দু নেতারা বাঙালীদের অনেক পরে চিন্তা করতে পেরেছিল পাকিস্তান-হিন্দুস্তান প্রতিষ্ঠার কথা। বাঙালীরাই গড়েছে পাকিস্তান-হিন্দুস্তান। বাঙালীরাই ভেঙেছে পাকিস্তান, বাঙালীরাই ভাঙ্গবে হিন্দুস্তান, এতে কোন সন্দেহ নাই ! এটা অন্তত আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বাঙালীরা আত্মঘাতী এবং হুজুগ প্রিয়। দ্রুতগতিতে কিছু গড়তে পারে, তার চেয়ে দ্রুত গতিতে তা' ভাঙতে পারে তবে গড়ার চেয়ে ভাঙার কাজে বেশী পারদর্শী। সে কারণেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারত ভাঙ্গার ব্যাপারে এ প্রতিভা খুবই কাজে লাগবে।

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য বিষয় হচ্ছে অবাস্তব সমাজতন্ত্র, জাতিয়তাবাদ নয়। বাঙালী জাতীয়তাবাদ এর ব্যাপারে তার যেমন কোন আকর্ষণ নেই, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এর ব্যাপারেও তার কোন বিকর্ষণ নেই, তবে বাঙালীর সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার আন্দোলনে তার সমর্থন পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস- কারণ সাংস্কৃতিক মুক্তির আন্দোলনে বিপজ্জনক ঝুঁকি নেই। "সাংস্কৃতিক যুদ্ধ" পশ্চিমবাংলার নিষ্প্রাণ বুদ্ধিজীবীদের মাঝে কিছুটা প্রাণের সঞ্চার করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা দরকার। কোন অঞ্চলের বিদগ্ধ সমাজ

যদি নিস্তেজ হয়ে যায় তাবে তাকে সতেজ করার একমাত্র উপায় হলো ঐ সমাজকে আন্দোলনে জড়িয়ে ফেলে সচল হতে বাধ্য করা। নিরোদ চন্দ্র চৌধুরী পশ্চিমবাংলার মানুষদেরকে 'চলন্তমমি' বা 'চলন্ত লাশ' আখ্যা দিয়েছিলেন। কথাটি অনেকাংশে সত্য।

পশ্চিম বাংলার মানুষ মূল বাংলাদেশ ভূখন্ডের মানুষেরই স্বজাতি, নিজদেশে তারা পরবাসী হয়ে আছেন ভারতীয় নাম ধারণ করে। ১৯৪৬-৪৭ এর পরিস্থিতি তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিল বাঙালী পরিচয় বিসর্জন দিয়ে ভারতীয় নাগরিক বনে যেতে। কিন্তু জাতিগত পরিচয় মুছে ফেলা প্রায় অসম্ভব। সৃষ্টিকর্তা যাকে বঙ্গস্তানী করে বানিয়েছেন তিনি পাকিস্তানী বা হিন্দুস্তানী হবেন কেমন করে? পরমকরুনাময় যাকে মাছ-ভাত খাওয়ার জন্য শ্যামল সজল সবুজ বঙ্গবলয়ে জন্ম দিয়েছেন তিনি হালুয়া-রুটি খাওয়ার জন্য ধুসর, উষর, খাকী রং এর শুষক হিন্দিবলয়ের বাসিন্দা হবেন কেমন করে?

১৯৪৭ সনে যা ঘটেছে তা ছিল ইহিহাস এর দুর্ঘটনা, জাতির স্বতঃস্ফুর্ত বিকাশ নয়। কেননা কংগ্রেস মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশ এই ত্রিশক্তির শীর্ষ নেতৃত্ব বাঙালীর হাতে ছিল না। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব ছিল গুজরাটিদের হাতে এবং মূলতঃ অবাঙালীদের সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত। যে শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের সৃষ্টি হয় সে অবস্থায় বিবেকবান মানুষের সুস্থ চিন্তার কোন অবকাশ ছিল না। সকলেই একটা সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন অন্তত কিছু সময়ের জন্য। মানবিক যুক্তির চেয়ে পাশবিক প্রবৃত্তির তাড়না ছিল বেশি শক্তিশালী-অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য।

যে জাতি তার নিজের ইতিহাস জানে না বা জানার পর বিস্মৃত হয়েছে সে জাতি কখনও জগতের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। কারণ সে তার অতীত গৌরবকে যেমন মনে করতে পারে না তেমনি ভবিষ্যতে গৌরব লাভ করতে পারবে এমন আত্মবিশ্বাস থেকেও নিজেদের বঞ্চিত করে।

দুঃখের বিষয়, অনেক শিক্ষিত বাঙালীও জানে না যে নিকট অতীতে অর্থাৎ পাকিস্তানী আমলে বাংলাদেশ এর নাম কি ছিল, পরে কি হয়েছে ইত্যাদি। ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট যেদিন পাকিস্তানের জন্ম হয় সেদিন থেকে ১৯৫৬ সালের ২২শে মার্চ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কাঠামোর মতই ছিল পাকিস্তানের কাঠামো। তখন বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব বঙ্গ বা পূর্ব বাংলা। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত এই ১৫ (পনের) বছর দেশের সরকারী নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। কারণ ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ থেকে পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান এক ইউনিট এবং সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান আর এক ইউনিট হিসাবে পরিগণিত হয় অর্থাৎ সমগ্র পাকিস্তানকে ২ (দুই) প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করা হয়। পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ যথা পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তান তাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বা বিলোপ করে একটি প্রদেশে পরিণত হয়েছিল - যার নাম হয় পশ্চিম

পাকিস্তান। ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ থেকেই পাকিস্তান এর সংবিধান রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকর হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান আমলের প্রথম ৯ (নয়) বছর এ দেশের নাম ছিল পূর্ববাংলা এবং তার পরের ১৫ (পনের) বছর নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। ২৩ (তেইশ) বছর পর ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ থেকে আমাদের দেশের নাম হয় বাংলাদেশ – অতি পুরাতন অবিভক্ত বাংলার নামই আবার নতুন করে দেয়া হলো বিভক্ত বাংলার ললাটে। যদিও সত্যিকার অর্থে এটা পূর্ণ বাংলাদেশ নয়– কেননা পশ্চিমবাংলা রয়ে গেছে ভারতীয় সীমানার মধ্যে এবং সেটা স্বাধীন নয়। তথাকথিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নামে একটি ভেজাল জাতিয়তাবাদ এর অক্টোপাস তাকে বেঁধে রেখেছে আজও। 'তথাকথিত' বলছি এ কারণে যে, 'হিন্দুস্তানী জাতীয়তা বা ভারতীয় জাতীয়তা আসলে কোন বিশুদ্ধ জাতিয়তা নয়– অনেক জাতীয়তার কৃত্রিম সংমিশ্রণ বা "ককটেল ন্যাশনালিজম।"এই বিচিত্র ধরনের "ককটেল ন্যাশনালিজম" যা এক সময়ের সোভিয়েত ন্যাশনালিজম এর অনুরূপ তা অদূর ভবিষ্যতেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের "ন্যাচারেল ন্যাশনালিজম" এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে বাধ্য হবে। পাকিস্তানেও একই ধরনের ৫ (পাঁচ) জাতির "ককটেল জাতীয়তাবাদ" বা পাঁচমিশালী জাতীয়তাবাদ বিরাজ করছে যা ভবিষ্যতে ভেঙে যেতে পারে এবং একাধিক ভিন্ন ভিন্ন জাতির উদ্ভব হতে পারে। তবে পাকিস্তানের তুলনায় এ আশংকা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অনেকগুণ বেশি কারণ ভারত এর কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই সৃষ্টি করেছে অনেক জাতিভেদ ও বৈষম্যের। যেমন আসাম রাজ্যকে ৭ (সাত)টি রাজ্যে খন্ড বিখন্ড করে ফেলা হয়েছে। বিহার, উড়িষ্যা, কাশ্মীর, পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরার প্রতি প্রদর্শন করা হচ্ছে চরম বৈষম্যমূলক নীতি। প্রকৃত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এর ভিত পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ এর ভিত এর চেয়েও অনেক দুর্বল কারণ প্রদেশগুলো বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত। ব্যাপক অর্থে বাংলাদেশ বলতে শুধু এককালের পূর্ববাংলার মাটি আর মানুষকেই বুঝায় না বরং সীমান্তের অপর পারের পশ্চিমবাংলার মাটি আর মানুষকেও বুঝায়। বঙ্গবন্ধু বলতে উভয় বঙ্গেরই বন্ধু বুঝায়। অনেক এর কাছেই বিষয়টি স্পষ্ট নয়। সোনার বাংলার সোনালী স্পর্শের বাইরে পশ্চিমবাংলা থাকতে পারে না।

ব্রিটিশ আমলে এই ভুখন্ডের নাম ছিল বঙ্গ বা বেঙ্গল। ১৯৪৭ পর্যন্ত আমাদের জাতীয় পরিচয় ছিল ভারতীয় যদিও দুইবাংলা একসাথেই ছিল তখন পর্যন্ত। আঞ্চলিক পরিচয় ছিল বঙ্গীয় বা বাঙালী। অখন্ড বৃহিত্তর বাংলার অধিবাসী ছিলাম আমরা। এদেশকে কেউ বলতেন বঙ্গদেশ আবার কেউ বলতেন বাংলাদেশ, তখন অখন্ড বাংলার রাজধানী ছিল কলিকাতা। ১৯৪৭ সনের আগে দুই বাংলা যখন এক ও অবিভক্ত ছিল তখন এর নাম ছিল "বাংলাদেশ" কাজেই এই "বাংলাদেশ" নামের ভেতরই লুকিয়ে আছে স্বাধীন অখন্ড বাংলা গঠনের সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ও প্রাণের দাবী ছিল সকল বাঙালী একত্রিত হয়ে একদেশে ঐক্যবদ্ধ হবে। আজ বাঙালী বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি – ' এক জাতি দুই দেশ' এই তার খন্ডিত পরিচয়। অখন্ড পরিচয়ে গৌরবান্বিত হবে একদিন গোটা বাংলা।

রবিন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গান–

"বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মান

বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।”

এই প্রার্থনা সঙ্গীতে “এক হোক” কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। আমরা প্রায়াত কবির প্রার্থনাকে বাস্তবে পূর্ণরূপ দিতে না পারলেও আংশিক রূপ দিতে সমর্থ হয়েছি ১৯৭১ সালে যখন সকল বাঙালী এক না হলেও অন্তত এক হওয়ার ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে পশ্চিমাবাংলার আপামর জনগণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, সাহায্য, আশ্রয়দান ইত্যাদি সেই ইচ্ছারই পরোক্ষ প্রতিবিম্ব। প্রত্যক্ষভাবে সেই ইচ্ছার প্রতিফলন তখন সম্ভব বা কাম্য কোনটাই ছিল না। কারণ একইসাথে পাকিস্তান-হিন্দুস্তান দুই শক্তির সাথে সংঘাতে যাওয়া সুবুদ্ধির কাজ হতো না। ইতিহাস এর কিছু ক্রান্তিকাল আছে। একাত্তরের ক্রান্তিকাল ছিল পাকিস্তান থেকে এই বাংলার মুক্তির পর্ব - একুশ শতক এর সূচনায় যে ক্রান্তিকাল আসছে তা হবে হিন্দুস্তন থেকে ঐ বাংলার মুক্তির পর্ব।

একই ভারত এর ভূসংলগ্ন রাজ্যহিসাবে পশ্চিমবাংলা মানুষের পক্ষে একা মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব হবে না - যদি বাংলাদেশের মানুষ সেই মহাসংগ্রামে মিত্রশক্তির ভূমিকা পালন না করে। তখন অবশ্যই গোটা পূর্ব হিমালয়ে অঞ্চল একটি প্রচন্ড অগ্নিবলয়ে পরিণত হবে। যে কারণে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে সে কারণেই পূর্ব হিন্দুস্তান ও স্বাধীন হবে। পূর্ব হিন্দুস্তান বলতে আমি গোটা পূর্ব হিমালয় অঞ্চল এর অস্বাধীন রাজ্যগুলোকে বুঝাচ্ছি। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা, আসাম। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা যখন রয়েল বেঙ্গল টাইগার এর মতো গর্জন করে উঠবে দিল্লীর বিরুদ্ধে তখন থেকেই সত্যিকার বঙ্গবিপ্লব শুরু হবে এবং বঙ্গজননীর পূর্ণ অবয়ব না দেখা পর্যন্ত বাঙ্গালীরা থামবে না।

কবির ভাষায় -
‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে
কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে
বাহির হলে জননী।’

বাংলাদেশের হৃদয় হতে বঙ্গজননীর আবির্ভাবের কথা লিখে কবি আমাদেরকে মাতৃভূমি তথা মাতৃবাংলার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ এর কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা বুঝিনি কারণ আমরা বুঝতে চাইনি। সদিচ্ছার অভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে বাংলাদেশ মূর্তহয়ে উঠেছিল তা ছিলবঙ্গমাতার পূর্ণ অবয়ব, খন্ডিত অবয়ব নয়। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতিসত্ত্বা হয়েও আমরা আজ পরাজিত। আমাদের অবস্থান পেছনের সারিতে। পরাজিত বলছি একারণে যে পশ্চিম রণাঙ্গণ তথা ওয়েসর্টার্ন ফ্রন্টে আমরা জয়ী হতে পারিনি যদিও ইস্টার্ন ফ্রন্টে আমাদের বিজয় ১৯৭১ সনেই সুনিশ্চিত হয়েছে।

সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের অধিবাসীকেও যদি আমরা একজাতি হিসাবে গণ্য করি – (যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা প্রায় ১৫টি ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভিত্তিক জাতি গোষ্ঠিতে বিভক্ত) তবুও আমরা বিশালত্বের দিক থেকে তার পরেই স্থান পাই, তৃতীয় বৃহত্তম জাতি গোষ্ঠী হিসাবে। কিন্তু ভারতবর্ষ যেহেতু কোন একক জাতি নয়; হিন্দুত্বের আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো পাঁচমিশালী জাতিমালার সংমিশ্রণ সেহেতু নির্ভেজাল একক জাতিসত্ত্বা হিসাবে বাঙালীরাই পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম (ভারতীয়রা নয়)। চীনারা বৃহত্তম জাতি। প্রাচীন বাংলার খন্ডাংশগুলোকে একত্রিত করে হিসাব করলে দেখা যায় একভাষা, বর্ণ ও সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ আর কোন জাতি আমাদের চেয়ে বড় নয় একমাত্র চীনারা ছাড়া। এ বিষয়টি সত্যিই রোমাঞ্চকর ও প্রেরণাদায়ক। ব্রিটিশ, ফরাসী, জার্মান, আমেরিকান, রাশিয়ান, স্পেনীশ, আরব, জাপানী, তামিল, তেলেগু পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, মাড়োয়ারী, রাজস্থানী, মারাঠী সকলেই জনসংখ্যার দিক থেকে বাঙালীর চেয়ে ছোট জাতি। ভারতবর্ষ নামক মহাদেশ – সম বিশাল অঞ্চলে বাস করে তামিল, তেলেগু, রাজপুত, গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, পাঠান, কাশ্মিরী, সিন্ধী, বেলুচী যারা সকলেই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন জাতি। ভাষার বিশালত্ব সম্পর্কেও বলতে গেলে বলতে হয় বর্তমান বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ভাষা হচ্ছে বাংলা। চীনা ভাষা ও ইংরেজী ভাষার পরেই এর স্থান। বিপুলসংখ্যক বাঙালী এই চমকপ্রদ তথ্য সম্পর্কে অবহিত নয়। সম্মিলিত বাঙালীর সংখ্যা প্রায় ২৪ (চব্বিশ) কোটি হবে। আমেরিকা এবং রাশিয়ার সকল অধিবাসী বিশুদ্ধ মার্কিন বা রাশিয়ান নন। বাঙালীরা শুধু তাদের ব্যর্থতা, পরাজয়, আর ক্ষুদ্রত্বের কথাই জানে; সাফল্য, বিজয় আর বড়ত্বের কথা জানে না।

কবি সুকান্তের ভাষায় –

"হিমালয় থেকে সুন্দরবন হঠাৎ বাংলাদেশ
কেঁপে কেঁপে উঠে পদ্মা উচ্ছ্বাসে।

সাবাস বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।"

পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা, আসাম আর আরাকানের বাঙালীরা যদি আমাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে তবে আমরা তাদেরকে উপহার দিতে পারি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতির নাগরিকত্ব। মহাজাতি হিসাবে চীনা জাতির পরই বাঙালীদের স্থান। দুঃখের বিষয়, বাঙালীরা যে মহাজাতি একথা তারা নিজেরাই জানে না। ভারতীয়রা এবং পাকিস্তানীরা মহাজাতি নয়। কেননা কৃত্রিম এবং বহুজাতির পাঁচমিশালীতত্ত্ব হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছে। তাই বর্তমান যুগের ঐতিহাসিক প্রয়োজন হলো 'মহাবাংলাদেশ' গঠন কিংবা 'বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র' অর্থাৎ 'বাংলাদেশ কনফেডারেশন' গঠন।

স্বাধীনতার পর অন্নদাশংকর রায়ের সাথে ঢাকায় সাক্ষাৎ ও সংলাপ এর এক পর্যায়ে শেখ মুজিব বলেছিলেন "আমরা সকল বাঙালী একজোট হলে কিনা করতে পারি। ভারত জয় করতে পরি।" বঙ্গবন্ধুর এ উক্তির মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর বাংলা গঠনের আন্তরিক ইচ্ছাই প্রতিফলিত হয়েছিল। কলিকাতার আনন্দবাজার ও ঢাকার বাংলাবাজার পত্রিকায় অন্নদাশংকর এর লেখা "২১শে ফেব্রুয়ারী ওদের, আমাদেরও" শীর্ষক নিবন্ধটি ১৯৯৪ সালের শহীদ দিবস সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।

১৯৪৭ এর পূর্বের অন্ধ আবেগ সাম্প্রদায়িকতার যে ব্যারিকেড তৈরী করেছিল (লীগ ও কংগ্রেস এর অবাঙালী নেতৃত্বের হাইকমান্ড এর ভূমিকা দ্বারা) তার ফলে ইতিহাস এর সোনালী রাজপথ রুদ্ধ হয়ে যায় বাঙালীদের জন্য। সামনে এগিয়ে চলার সোজা পথ বন্ধ হয়ে গেল বলে দু পাশের সংকীর্ণ অন্ধকার গলিপথ ধরে দুই বাংলার মানুষ এর যাত্রা শুরু হলো দুই বিপরীতমুখী স্রোতোধারায়, তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপারটি ছিল একান্তই গৌণ। করাচী এবং দিল্লী যথাক্রমে মুসলিম ও হিন্দু বাঙালীর অভিভাবক সেজে বসলো অন্য অর্থে শাসক ও শোষক সেজে বসলো; ঢাকা আর কলিকাতা পড়ে রইলো দ্বিতীয় সারিতে। শুধুমাত্র দুই দেশের দুইটি প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা মাত্র তারা পেল, কোন স্বায়ত্তশাসন ছাড়া। দুই বাংলার বাঙ্গালীরাই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো অবঙালী কর্তৃত্বও প্রাধান্যের কাছে। একটিমাত্র ক্ষেত্রে দুই বাংলার মধ্যে অপূর্ব সাদৃশ্য দেখা গেল আর তাহলো উভয় বাংলাই তাদের কেন্দ্রীয় সরকার এর বৈষম্যনীতির শিকার হলো। শোষণ আর বঞ্চনার কালোছায়া দুই বাংলার আকাশেই নেমে এলো। সকল বাঙালী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলো ৪২ থেকে ৪৭ এই অর্ধযুগের ভুল রাজনীতি তাদেরকে আজ কোন অন্ধকার এর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ধর্মতত্ত্ব তথা দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তা মূলতঃ ছিলেন অবাঙালীরা। অবাঙালী মুসলমান আর অবাঙালী হিন্দু অন্তত একটি বিষয়ে একমত পোষণ করতেন আর তা' হলো বাংলা ও পাঞ্জাবকে দ্বিখন্ডিত করতে হবে, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে। কিন্তু মহাভ্রান্তির বিষয় এই যে, ভারতবর্ষ বহুজাতি তত্ত্বের উপযোগী এমন এক বিশাল বিচিত্র ভূখন্ড যা মহাদেশ নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। একে উপমহাদেশ নাম দেয়া মোটেও যুক্তিসঙ্গত হয়নি। জাতিসংঘ যদি ভারত উপমহাদেশ এর নাম সংশোধন করে মহাদেশ নাম রাখে তবে তা সঠিক ও যর্থাথ হবে। নিউজিল্যান্ড, ফিজি আইল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া এই তিনটি মাত্র দেশ নিয়ে এবং মাত্র দেড় কোটি লোক সংখ্যা নিয়ে যদি 'অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ" নাম হতে পারে তা হলে সার্ক অঞ্চলের সাতটি দেশ নিয়ে এবং প্রায় একশত কোটি লোকসংখ্যা নিয়ে ভারত মহাদেশ কেন হতে পারে না তা আমার বোধগম্য নয়। দুই জাতি তত্ত্বের স্থলে তিন জাতি তত্ত্ব কার্যকর হয়ে গেছে ১৯৭১ থেকেই। ভারতের ২৫টি রাজ্যে কমপক্ষে ১৫টি পৃথক জাতিসত্ত্বার অস্তিত্ব ও উপাদান রয়েছে – ভাষা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসহ। জাতিসংঘের কাছে অবিলম্বে এ দাবী জানানো দরকার। কিন্তু হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকরা এ দাবীর বিরোধিতা করবেন। তাদের ভয় হলো, এতে করে পাকিস্তানে পাঁচটি এবং ভারতে দশটি পৃথক জাতিসত্ত্বার উদ্ভব হতে পারে। এই জাতিসত্ত্বাগুলোর বিকাশের স্বার্থে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান ইউনিয়ন

এর বর্তমান কাঠামো ভেঙে ফেলার প্রয়োজন হবে। অদূর ভবিষ্যতেই এই ঐতিহাসিক প্রয়োজন মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস। আবহমান বাংলার খন্ডাংশগুলো তখনই জোড়া লাগতে পারে, যখন ভাঙ্গন প্রক্রিয়া শুরু হবে সারা ভারতবর্ষের বিশাল দেহে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের ভাঙ্গন প্রক্রিয়া থেকে জন্ম নেবে আবহমান বাংলার পুর্নগঠন প্রক্রিয়া। পুনর্মিলিত বাংলার জনসংখ্যা হবে প্রায় ২৪কোটি। বাংলাদেশের ১৩ কোটি বাঙালী আর ভারত-বার্মার ১১ কোটি বাঙালী মিলে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতির পুনরুত্থান ঘটবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই মহাজাতি আকারে শুধু চীনা জাতির চেয়ে ছোট হবে। গণতান্ত্রিক বিশ্বের তথা মুক্ত বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে বাঙালী জাতি। বতর্মান সীমানা ধরে আমরা দেশ হিসাবে ছোট হলেও জাতি হিসাবে অনেক বড়-কারণ জাতীয়তার ব্যাপ্তি বর্তমান সীমান্ত ছাড়িয়ে পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে অনেক দূর বিস্তৃত।

সুবিশাল মহাদেশসম ভারতে বাঙালী যে একটি স্বতন্ত্র সুবিশাল জাতি, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সুতীব্র আন্দোলন ইতিহাসে তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর রেখে গেছে। ১৯০৫ সনের ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লেগেছিল ১৯১১ সনে। বিদেশীরা ভেঙ্গেছিল বলে আমরা জোড়া দিয়েছিলাম। ১৯৪৭ এ স্বদেশীরা ভেঙ্গেছিল তাই বিদেশীরা জোড়া লাগাবে আগামীতে। আমাদের ভূমিকাও অবশ্যই থাকবে কারণ আমরা চিরকাল বিদেশীদের অনুকরণ করেছি। ১৯১১ সনে আমাদের বাঙালীত্ব স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয় বিদেশীদের কাছে ধাক্কা খাওয়ার পর। তবে ১৯৪৭ এ স্বদেশীদের ধাক্কা বিদেশীদের চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক ছিল। ১৯৫২, ১৯৬৯ ও ১৯৭১ সনের সংগ্রাম মুখর দিন গুলোর সাথে ১৯০৫ - ১৯১১ এর সংগ্রামের স্মৃতি এক হয়ে মিশে গেছে বাঙালীর অস্তিত্বের সাথে।

"বাঙালী একা একশ হতে পারে কিন্তু একশ বাঙালী কখনও এক হ'তে পারে না" - এ প্রবাদ বাক্যটি বাঙালী জাতির ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য; কিন্তু ১৯৭০-৭১ এর ইতিহাসে তা প্রথমবারের মত মিথ্যা বলে প্রামানিত হয়েছে। কোটি কোটি বাঙালী ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল স্বাধীনতার ডাকে। ভাষা আন্দোলন ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন একইভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছিল গোটা বাঙালী জাতিকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে এটা সর্বাংশেই নেতৃত্বের ব্যাপারে। উচ্চতম পর্যায়ে নেতৃত্ব যদি ঠিক থাকে তখন জাতীয় সংকট চরমে উঠলেও মহাজাতি বাঙালী ঐক্যদ্ধভাবে ত্যাগস্বীকার করতে পারে এবং তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারে; ৫২, ৬৯, ৭০ এবং ৭১ এর ইতিহাস তার জ্বলন্ত প্রামণ। বঙ্গ-উপসাগর এর তরঙ্গমুখর সফেন উচ্ছাস এর সাথে, সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল এর গর্জনের এর সাথে সেই মহাজাগরনের রয়েছে অপূর্বমিল। অন্নদাশংকর রায়ের উদ্ধৃতি থেকে বলছি - "আমরা সকল বাঙালী একজোট হলে কিনা করতে পারি ? ভারত জয় করতে পারি" - শেখ মুজিব কথাটি বলেছিলেন অন্নদাশংকর রায়কে। সঙ্গে উপবিষ্ট আর একজন (নাম উল্লেখ করেননি) অন্নদাশংকরকে বলেছিলেন - " আপনারা ভারতের অধীনে রয়েছেন কেন? আমাদের সাথে মিশে গেলে স্বাধীন হবেন।" আনন্দবাজার পত্রিকায় অন্নদাবাবু তার নিবন্ধে শেখ মুজিবুর রহমান এর এই উক্তির উল্লেখ

করেছেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে অন্নদাশংকর রায়ের সাক্ষাৎ ও সংলাপ এর একটি অংশ থেকে বুঝা যায় যে, বঙ্গবন্ধ মনে মনে যা চাইতেন তা পুরোপুরি বাস্তবে রূপ দিতে পারেননি - সহজবোধ্য কারণেই তা পারেননি। তার ব্রত বা মিশন কিছুটা অসমাপ্ত রয়ে গেছে। পরবর্তী প্রজন্মকে অবশ্যই তার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এর সাথে মিশে আছে নেতাজী, দেশবন্ধু আর আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের স্বপ্ন। আরো মিশে আছে শেরেবাংলা, সোহরাওয়ার্দী, ভাসানীর স্বপ্ন। বৃহত্তর বাংলার মহান প্রবক্তা শরতবসু ও আবুল হাসেম এর প্রাণের দাবী ছিল অবিভক্ত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা। এদের অতৃপ্ত আত্মা পথ চেয়ে বসে আছে কবে বাঙালী আবার জাগবে - কবে এক হবে সোনারবাংলা? বিশ্বের আর কোন দেশ এর নামের আগে "সোনার" কথাটি যুক্ত হয়নি। মাত্র সাড়ে তিনশত বা চারশত বছর আগে এ দেশ ছিল বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল। অন্ন, বস্ত্র, ফল-ফুল, শাকসবজি আর সোনা-রূপায় সে ছিল সকল দেশের সেরা।

ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা
আমাদের এই বসুন্ধরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি !
সকল দেশের রাণী সে যে
আমার জন্মভূমি !
স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।"

কবির একথা তখন সত্য ছিল। প্রায় দুইশত বছরের ব্রিটিশ শাসন-শোষণ সোনার বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করে। এ অবস্থা থেকে আজও আমরা সম্পূর্ণ মুক্তি পাইনি। পূর্ব সীমান্তে আমরা জয়ী হয়েছি পাকিস্তানীদের হটিয়ে। পশ্চিম সীমান্তেও জয়ী হবো হিন্দুস্তানীদের হটিয়ে। তারপর পূর্ব -পশ্চিম এক হওয়ার পালা। এক হবে দ্বিখন্ডিত বঙ্গমাতা। জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী। স্বর্গের চেয়েও বড় আবহমানকালের শাশ্বত মাতৃবাংলাকে আমরা ফিরে পাবো। তার ক্ষতবিক্ষত দেহে যে শান্তির মলম প্রলেপিত হবে তার নাম 'সর্ববঙ্গবাদ' বা 'প্যান বেঙ্গলিজম'। আবহমান বাংলার পশ্চিম সীমান্ত বেনাপোল নয় দ্বার ভাঙ্গা বা দ্বারবঙ্গ (বাংলার দ্বার)। দ্বারবাংলার পর থেকেই ভারতবর্ষের উর্দু-হিন্দি, বলয়ের শুরু। দ্বারভাঙ্গা আসলে দ্বারবঙ্গ বা বঙ্গের দ্বার। ইংরেজীতে এর নাম 'গেট অব বেঙ্গল'। পশ্চিমবাংলার বিদগ্ধ বিহঙ্গরা এখন হিন্দি গগনে ডানা মেলে উড়ছেন কৃত্রিম উল্লাসে। তাদের বলতে হবে - 'এখনি অন্ধ! বন্ধ কর পাখা।' অর্ধ শতাব্দীর বেশিকাল ধরে এক কৃত্রিম জাতীয়তার খোলস পরে আছে তারা। বঙ্গবাদ একদিন হিন্দুস্তানী জাতিয়তার মৃতুঘন্টা বাজাবে। আরামপ্রিয় উচ্চবিত্তরা নয় বরং নিম্নবিত্তরাই এ ধরনের বিপ্লবকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। একুশ শতকের 'বঙ্গবিপ্লব' এর মূলমন্ত্র হবে 'বঙ্গবাদ' - যা ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত - যা বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রবিন্দু। 'বঙ্গবাদ' দ্বারা প্রগতি পথের সকল বাধা দূর

করা যাবে – দূর করা যাবে ধর্মীয় গোঁড়ামির সকল প্রতিবন্ধকতা। 'বঙ্গবাদ' হচ্ছে এক কথায় বাঙালীর ' এক জাতি তত্ত্ব' বা 'ওয়ান ন্যাশন থিওরী।'

ইতিহাসে স্থান কাল পাত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই সময়ে যদি বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ না হয়ে ঢাকায় থাকতো অর্থাৎ রাজধানী যদি ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ স্থানান্তর না হতো তাহলে পলাশীতে কোন যুদ্ধ হতো না। – যুদ্ধ হতো সোনারগাঁয়ে, বিক্রমপুরে, কিংবা ময়নামতি, জয়দেবপুর, সাভার ইত্যাদি যে কোন একটি অঞ্চলে – যেখানে পলাশীর মত নির্জন কোন প্রান্তর বা আম্রকুঞ্জ নেই। ঢাকায় কিংবা তার প্রতিবেশী অঞ্চলে যুদ্ধ হলে ইংরেজদের জয়লাভ করা তো দূরের কথা তারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। কারণ এ অঞ্চল ছিল জনবহুল এবং অধিবাসীরা সাহসী, সচেতন এবং সতর্ক। তাছাড়া প্রচুর জলাভূমি থাকাতে এ অঞ্চলে ইংরেজ সৈন্যদের চলাচল খুবই দুঃসাধ্য হতো। জনাকীর্ণতা এবং জলাকীর্ণতা এ দুটি বিষয় প্রকান্ড বাঁধা হয়ে দাঁড়াতো স্থলযুদ্ধের ক্ষেত্রে। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের লোকেরা বেশিরভাগ ছিল উর্দুভাষী, আরাম আয়েশ প্রিয় মোসাহেব ধরনের লোক। পলাশীর আশপাশের লোকেরা ছিল সহজ, সরল, ভীরু, নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। ওরা ছিল নবাবদের রাজশক্তি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাছাড়া মুর্শিদাবাদ এর অভিজাত রাজশক্তি ছিল বিলাস ব্যসনে মগ্ন এবং একই কারণে গণবিচ্ছিন্ন। পলাশীর যুদ্ধের মত একটি বড় ঘটনা তাদের নিত্যদিনের একঘেঁয়ে জীবন প্রবাহে কোন ঢেউ তোলেনি। যুদ্ধচলাকালে অনেক চাষী ক্ষেত নিড়াচ্ছিল এবং বলদ দিয়ে ক্ষেত লাঙ্গল দিচ্ছিল। লর্ড ক্লাইভ নিজেই স্বীকার করেছিলেন – তার ক্ষুদে ইংরেজ বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা দেখার জন্য রাস্তার দু'ধারে যে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল – তাদের প্রত্যেকে একটা করে পাথর ছুঁড়ে মারলে তার বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো, পলাশী পর্যন্ত পৌঁছুতেও পারতো না। বাঙালীর এমনই দুর্ভাগ্য যে এদেশের জনগণ সজাগ, সতর্ক ও সচেতন ছিল না বলেই এতো সহজে বিদেশী বণিকচক্র এদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে পেরেছিল। একটি বাণিজ্যিক কোম্পানী একটি দেশ ও জাতির ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলো। মাত্র উনিশ বছরের কিশোর নবাব সিরাজ এর পক্ষে মাত্র চার মাস স্থায়ী রাজত্বকালে দেশী – বিদেশী সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া মীরজাফর, জগতশেঠ, উঁমিচাদ এরা প্রকৃত পক্ষে বাঙালী ছিলেন না।

১৯৫৭ সনের ২৩শে জুন পলাশীর আমবাগানের সবুজ আঙিনায় বাংলার স্বাধীনতার যে রক্তিম সূর্য অস্তমিত হয়েছিল তা পুনরায় উদিত হয় মেহেরপুর এর আমবাগানে ১৯৭১ এর ২৬শে মার্চ। বাংলার সূর্য এখন আলো ছড়াচ্ছে পূর্বে–পশ্চিমে, উত্তরে–দক্ষিণে সর্বত্র। পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা আর আসাম এর অন্ধকার দূর হবে অচিরেই। যে যমুনা সেতু দুই বাংলার স্থলবন্ধন রচনা করতে যাচ্ছে তার নাম অনায়াসে বঙ্গসেতু রাখা যায়। এশিয়ান হাইওয়ের যে অংশ দ্বারভাঙ্গা থেকে আকিয়াব পর্যন্ত বিস্তৃত তার নাম "বঙ্গ মহাসড়ক" দেয়া যায়। এটা হবে ঐতিহাসিক রাজপথ যা পশ্চিমবাংলা, বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, আসাম আর

আকানবাসীদেরকে একই পথের পথিক বানাবে।

সমগ্র বাংলাভাষী অঞ্চলে অবিলম্বে বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক উত্থান এখন সময়ের দাবী – একুশ শতক এর বাংলা বিশুদ্ধ বঙ্গীয় সংস্কৃতির বাংলা। এই নয়া ভাষা আন্দোলন বায়ান্ন সনের ইতিহাস তার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক শুদ্ধি অভিযান চলবে গোটা বঙ্গবলয় জুড়ে – ঢাকা, কলিকাতা, দার্জিলিং, আগরতলা, গৌহাটি সর্বত্র চলবে বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক শুদ্ধি অভিযান।

স্বাধীনতা উত্তর ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ ও সংলাপ এর সময় শেখ সাহেব এর পাশে বসে থাকা ভদ্রলোকটির প্রশ্নের উত্তরে অন্নদা শংকর রায় বলেছিলেন – "আমি বলি, আমরা আপনাদের মত শুধু বাঙালী নই, আমরা সেই সাথে ভারতীয়; আমরা কাশী, কাঞ্চীম, উজ্জয়িনী, গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, পুরীর মন্দির, আগ্রার তাজমহল, অজন্তা, ইলোরা, বিন্ধ্যা, হিমালয়, রামায়ন, মহাভারত, অশোক, আকবর ত্যাগ করতে পারবো না। তারচেয়ে বরং, পদ্মা, মেঘনা, কর্ণফুলি, বুড়িগঙ্গা, পাহাড়পুর, মহাস্তানগড়, ময়নামতি, সোনারগাঁও, ঢাকেশ্বরী, চন্দ্রনাথ ছাড়বো। তা বলে কৃত্তিবাস, মসলিন ছাড়বো না। সুযোগ পেলেই দেখতে আসবো। সম্পর্কটা ঝালিয়ে নিতে আসবো।" অন্নদাশংকর এর এই উক্তিগুলো বিশ্লেষণ করলে যে কেউবুঝতে পারবেন কি ধরনের দ্বিচারিতা, বিভ্রান্তি, স্ববিরোধিতা ও অস্পষ্টতা রয়েছে তার কথায় ও চিন্তায়! এমন একজন বড় মাপের সাহিত্যিক, যিনি নিজেকে একজন বড় ধরনের বঙ্গপ্রেমিক বলে গর্ববোধ করেন। উনার মত এতবড় ব্যক্তিত্বের কথায় যদি এ ধরনের অসংগতি ও দ্বিধা-সংশয় প্রকাশ পায় তাহলে পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ কার কাছ থেকে দিক নির্দেশনা পাবে? হতাশ হবার কারণ নেই। দিকদর্শনতারা অবশ্যই পাবে। এমন নেতৃত্বের কাছে তারা দিকদর্শন পাবে যা বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা ভারাক্রান্ত নয়। কলিকাতা কেন্দ্রিক নিষ্প্রাণ বুদ্ধিজীবীদের দৌড় আমাদের জানা আছে। তারা মাঝে মাঝে 'বঙ্গমাতা' 'বঙ্গমাতা' বলে চিৎকার করে থাকেন আবার সামান্য অসুবিধায় পড়লেই ভারতমাতার আঁচল ধরেন নিজেদেরকে বাঁচাবার তাগিদে। অন্নদাশংকর রায়ের কাছে আমার প্রশ্ন, তিনি কি হতে চান ? এক সন্তানের কি দুই মা হয়? হতে পারে, দ্বিতীয় মা যদি সৎ মা হয়। প্রকৃত অর্থেই নয়াদিল্লী পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরাবাসীর সৎ মা। এতোদিন বিহার এবং আসামকে কয়লা ও তেলের জন্য রয়েলটি দেয়া হয়েনি। এখন যুক্তফ্রন্টের শরীক হিসাবে বিহার ও আসাম এর প্রতিনিধিত্ব থাকাতে তারা উপযুক্ত রয়েলটির দাবী আদায় করতে পারছে। ন্যায্য অধিকার আদায়ের দাবীকে কি আঞ্চলিকতা বলা যায় ? নয়াদিল্লীর অধিকর্তারা তাই বলে থাকেন আর এই আঞ্চলিকতার রাজনীতিই অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতার প্রদীপ জ্বালাবে গোটা উত্তর-পূর্ব ভারত তথা গোটা পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে। স্বাধীনতার সোনার তরী আজ পূর্ব থেকে পশ্চিমে বয়ে চলেছে ধীরে ধীরে হিন্দিস্রোতের বিপরীতে ভাটি থেকে উজানে অতিকষ্টে। কিন্তু দৃঢ় পায়ে গুন টেনে টেনে শিল্পী আচার্য্য জয়নাল আবেদীন এর আঁকা ছবির মত। গোয়ালন্দ হয়ে শিয়ালদা যাবে সে তরী।

অন্নদাশংকর রায়দের মত বুদ্ধিজীবীদের কারণেই বাংলা মা- এর এ দুরবস্থা ! যে মহাবুদ্ধিজীবী নিরোদ সি, চৌধুরী 'আত্মঘাতী বাঙালী' নামক বইটি লিখলেন যিনি পশ্চিমবাংলার হিন্দু বাঙালীদের দায়ী করলেন ১৯৪৭ এর বঙ্গভাগ এর জন্য, তিনি নিজেও অজ্ঞাতসারে একজন ভারতীয় বনে গিয়েছিলেন। তার বিখ্যাত বই এর নাম 'একজন অখ্যাত বাঙালীর আত্মচরিত' না হয়ে 'একজন অখ্যাত ভারতীয়ের আত্মচরিত' হলো ? আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি বাঙালী হিন্দু লেখকদের লেখায়, আর তা'হলো একটি অবাস্তব প্রচ্ছন্ন বাসনা - এপার বাংলা ওপার বাংলা এক হয়ে যাওয়া উচিত - তবে তা হোক ভারতীয় ইউনিয়নের অধীনে - স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অধীনে দুইবাংলার পুনর্মিলন হোক একথা তারা কোথাও খোলাখোলি কিংবা পরোক্ষভাবেও বলেন না - সর্বত্রই দিল্লী-তোষণ নীতি। অবশ্য তারা দিল্লীর ভ্রুকুটির ভয় করেন। একসময় বিখ্যাত গায়ক ভূপেন হাজারিকাকে নিগৃহিত হতে হয়েছিল ভারতীয় বাহিনীর হাতে সেই বিখ্যাত গানটির জন্য ঃ-

"পদ্মা আমার মা, গঙ্গা আমার মা!"
তার দুইচোখে দুই অশ্রুধারা, মেঘনা-যমুনা!"

শ্যামল মিত্রকেও একইভাবে হয়রানি করা হয়েছিল জনপ্রিয় সেই গানটির জন্যঃ-

"শিয়ালদহ গোয়ালন্দ আজও আছে ভাই, নিজের দেশে নিজে যাবো, পথ খুঁজে না পাই ?"

তিনি আরো গেয়েছিলেন "পদ্মা নদীর পারে
আমার ছোট্ট সবুজ গ্রাম,
আমি ফিরে কি পাব না তারে?"

শিল্পীর স্বপ্ন সফল হয়নি, শুধু রাজনৈতিক অঙ্গীকার·এর অভাবে। রাজনৈতিক অঙ্গীকার তৈরি করবে কে? সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান: যে বিশ্বের সকল বাঙালীকে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা রাখে ! বিশ্ববাংলাকে এক মালিকার বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে। আমি নিজে জন্মেছি অবিভক্ত বাংলায়, আমি কি মরবো বিভক্ত বাংলায়? বঙ্গ বিভক্তির কলংকজনক ইতিহাস আমার মত মানুষের এক জেনারেশনকেও অতিক্রম করতে পারেনি এখনও। এরইমধ্যে মূল বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে যার প্রভা পশ্চিমের অন্ধকার দূর করতে সক্ষম। এ আত্মবিশ্বাস থেকেই জন্ম নিবে বঙ্গবিপ্লব, যার হাতিয়ার হবে "বঙ্গবাদ"। এ সংগ্রাম বাঙালীর ইতিহাসের শেষ সংগ্রাম। পশ্চিমকে মুক্ত করা এবং পূর্বের সাথে যুক্ত করা এর একমাত্র লক্ষ্য। 'বঙ্গবাদ' এর ধ্যান-ধারণা অর্থাৎ পূর্নাঙ্গ বাঙালী জাতীয়তাবাদ এর ধ্যান-ধারণা প্রথমে স্পষ্ট হতে হবে পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরা রাজ্যের বাঙালীদের কাছে তার পর পরিষ্কার হবে বিহার উড়িষ্যা ও বাঙ্গারে বাঙ্গালদের কাছে।। বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে এক অসাম্প্রদায়িক মহাজাতিতত্ত্ব বাস্তবায়ন এর আন্দোলন এর ফলে ভারত ইউনিয়ন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক সম্পূর্ণ স্বাধীণ দেশ হবে অখন্ড বাংলাদেশ বা "মহাবাংলাদশ"

হিন্দি ভাষা ও সংস্কৃতির সমান্তরাল কিংবা তার চেয়েও বেশি মর্যাদা নিয়ে বিকশিত

হবে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি। বঙ্গবৃত্তের রাজ্যগুলো নিজেদের মধ্যে একটি বাংলা কনফেডারেশন গঠন করতে পারে যার কেন্দ্র হবে ঢাকা। তিনটি মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকবে। যোগাযোগ, পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা। যদি সদস্য রাজ্যগুলি সম্মত হয় তখন অর্থ ও কেন্দ্রীয় বিষয় হতে পারে। বাকি সব বিষয় বাঙালা কনফেডারেশনভুক্ত রাজ্যগুলোর হাতে থাকতে পারে- সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসনের নীতিমালা অনুসৃত হতে পারে রাজ্যগুলোর ব্যাপারে।

আগাগোড়া লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বাংলার ইতিহাস বেশ কুয়াসাচ্ছন্ন, দুর্বোধ্য আর প্রহেলিকাময়। বার্মার মত বাংলা ও ভারত-বহির্ভূত একটি আলাদা দেশ–যার রয়েছে স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। ভারত মহাসাগর এর পাশে ভারত উপমহাদেশ না হয়ে ভারত মহাদেশ হলেই বেশি শোভনীয় হতো।

আমরা ব্রিটিশ বর্বরতার শিকার হয়ে শুধু ক্ষতবিক্ষতই হইনি, খন্ড–বিখন্ডও হয়ে গেছি। আজ আমাদের শপথ গ্রহণ করতে হবে গণশিক্ষা, গণপ্রচান, গণমাধ্যম এবং টেলিভিশন, রেডিও'র মাধ্যমে নিখিল বাঙালাব আপামর জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে হবে।

বাংলার ভাঙা গড়ার ইতিহাসে একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় আর তাহলো গড়ার চেয়ে ভাঙার কাজেই বাঙালীর প্রতিভা সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে। আমাদের দুর্ভগ্যের মাহাকাব্য আমরা নিজেরাই রচনা করেছি ভুল নেতৃত্বের কারণে এবং নিজেদের আত্মবিশ্বাসের অভাবে। যে দিন পূর্ববাংলার মানুষেরা তাদের অংশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করার জন্য অস্থির হয়ে পড়লো সেদিন পশ্চিমবাংলার লোকের জন্য অত্যন্ত দুরদর্শিতা ও বুদ্ধির কাজ হতো যদি তারা গোটা বাংলা নিয়ে পাকিস্তানের পূর্ব অংশের অন্তর্ভূক্ত হতে রাজি হতো। তাহলে আলাদা হবার সময় গোটা বাংলা নিয়েই আলাদা হতে পারতো, উভয় সম্প্রদায় তখন ভুলে গিয়েছিল যে পাকিস্তান–হিন্দুস্তান গঠনের দ্বারা বাঙালীস্তানের কবর হয়ে গেল ১৯৪৭ এ। দুটি ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার কাছে বাঙালীর হাজার বছরের জাতীয়তা হার মানলো।

স্বাধীনতার আগে ও পরে বাংলার যে অংশটিকে শেখ মুজিব বাংলাদেশ নামে সম্বোধন করেছেন ওটা তো সম্পূর্ণ বাংলাদেশ নয়। ওটা খন্ডিত বাংলা। তাছাড়া জয়বাংলা শ্লোগানটিতে ঢাকা ও কলিকাতা মিলে যে বৃহত্তর অখন্ড বাংলা হয় তারই জয় মূর্ত হয়ে উঠে। কৌশলগত দিক থেকে বাংলাদেশ সৃষ্টি ছিল বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে শেখ মুজিব এর প্রথম পদক্ষেপ। অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী শেষের দিকে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন (প্রথমদিকে উনার পদক্ষেপ ভুল ছিল) স্বাধীন সার্বভৌম যুক্ত–বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে। কিন্তু পাকিস্তানী কাঠামোর মধ্যে থেকে তা কি করে সম্ভব হতো সেই বিভ্রান্তি তিনি দূর করার চেষ্টা করেননি। অদৃশ্য শক্তির নির্দেশে সোহরাওয়ার্দী বা শরতবসু কেউই সাধারণ বাঙালী জনতাকে বুঝাতে পারেননি – কোন ফর্মুলার ভিত্তিতে পাকিস্তান এবং

হিন্দুস্তান এর রাষ্ট্র–কাঠামোর বাইরে থাকতে পারে বাঙলাদেশ। কারণ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ না হয়ে যদি ত্রিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হতো তাহলে অবশ্যই অখন্ড স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বাস্তবানুগ হতো। রাজনীতিতে অস্পষ্টতা বা দ্বৈত ভূমিকা কোনভাবেই ফলপ্রসূ হয় না।

শহীদ সাহেব কংগ্রেস এর অবাঙালী নেতাদের তীব্র বিরোধিতার মুখে যুক্ত বাংলার দাবী ত্যাগ করতে এবং খন্ডিত বাংলাকেই মেনে নিতে বাধ্য হন। হিন্দু বাঙালীদের একটা যুক্তি অবশ্য ছিল; যেহেতু গোটা বাংলা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে থাকছে না বরং পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হতে চলেছে সে ক্ষেত্রে যুক্তবাংলা সমর্থন করার অর্থ পরোক্ষভাবে পাকিস্তান সৃষ্টিকে মেনে নেয়া যা সঙ্গত করণেই হিন্দু বাঙালীদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। কিন্তু তখন তাদের মধ্যে দূরদর্শী নেতা থাকলে অবশ্যই যুক্তবাংলা সমর্থন করতো যেকোন অবস্থায়, এমনকি–আপাততঃ পাকিস্তানী কাঠামোর মধ্যে থাকতে হলেও। কারণ অখন্ড বাংলার ভবিষ্যত পুনর্জন্মের সম্ভাবনা এ অবস্থার মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল। পাকিস্তানের বহিরাবরণ নিয়ে অখন্ড বাংলা ও বাঙালী জাতি সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করতে পারতো এবং ভবিষ্যতে অনায়াসে স্বাধীন হয়ে যেতে পারতো।

১৯৪৭ এর বঙ্গভঙ্গের জন্য শুধু হিন্দু বাঙালীদের উপর দোষ চাপালে সেটা যথাযথ হবে না। মুসলমান বাঙালীরাও তখন মুসলিম লীগের প্রভাবে পূর্ববাংলায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলকাতার দাঙ্গা প্রধানত মুসলিম লীগ হাই কম্যান্ডের ভুল নির্দেশের ফলে সংঘটিত হয়। দিল্লী প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার এক বছর পর ১৯৪৭ সালের ৯ই এপ্রিল সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দু নেতাদের বঙ্গভঙ্গ দাবীর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে জনাব সোহরাওয়ার্দী দৃঢ় তার সাথে ঘোষণা করেন যে, বাংলাকে কিছুতেই দ্বিখন্ডিত করা চলবে না। অতঃপর তিনি হিন্দু নেতাদের উদ্দেশে বলেন, "নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের আগে তারা অবশ্যই একটি সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করবেন এবং সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলাকে একটি মহান দেশ এবং বাঙ্গালীদের একটি মহান জাতিতে পরিণত করার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবেন।"

প্রয়াত আবুল হাশিম এবং শরতবসু ছিলেন যুক্ত বাংলার সংগ্রামে নির্ভীক সৈনিক এবং জনাব সোহরাওয়ার্দীর সহযোগী। অবাঙ্গালীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যদি "বসু সোহরাওয়ার্দী পরিকল্পনা " বানচাল না করতো তাহলে আজ বাংলার ইতিহাস হতো অখন্ড

বৃহত্তর সোনার বাংলার ইতিহাস। শেখ মুজিব তার রাজনৈতিক গুরু সোহরাওয়ার্দী তৎকালীন প্রয়াস এর কথা অবশ্যই জানতেন। তাছাড়া শেরে বাংলা এবং ভাসানী উভয়েই ছিলেন যুক্ত বাংলার প্রবক্তা। শেখ মুজিব এই তিনজনকেই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাহলে প্রশ্ন জাগতে পারে ৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম এর সময় কিংবা তার পরে তিনি কেন আহবান জানালেন না পশ্চিমবাংলার মানুষকে যুক্ত বাংলা গঠনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য? ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী জাতীয়তাবাদ তো শুধু মুসলিম বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বুঝায় না ? এ মনোভাব তার অন্তরে অবশ্যই ছিল প্রচ্ছন্নভাবে। কিন্তু তখনকার কৌশলগত দিকটি এ ধরনের চিন্তাধারার অনুকূলে ছিল না। পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শুধু পশ্চিমবাংলার সাহায্যে সফল হওয়া যেতো না – যদি ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য না করতো। তাই পশ্চিমবাংলা ঐতিহাসিকভাবে আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া সত্ত্বেও তা দাবী করা যায়নি কেননা তখন হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যেতে হতো বাংলাদেশকে – যা তখনকার পরিস্থিতিতে সম্ভব বা কাম্য ছিল না। অবশ্য আমরা যদি তখন ভারত এর বদলে চীন, বার্মা, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশের সাহায্য পেতাম বা নিতাম তাহলে পশ্চিমবাংলা দাবী করা সহজ হতো। কিন্তু চীন তখন পাকিস্তান ভাঙ্গার পক্ষে ছিল না। ইতিহাসের সেই ক্রান্তিলগ্নে এই কৌশলগত অসুবিধার দুরুন শেখ মুজিব প্রকাশ্যে পশ্চিমবাংলাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে কোন সংগ্রাম এর আহবান জানাতে পারেননি। অবশ্য তিনি যদি ডাক দিতেন তবে কি হতো বলা যায় না! কারণ পশ্চিমবাংলার মানুষেরা তাকে গণদেবতার আসনে বসিয়েছিল। তখনকার ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবতাকে না মানলে স্বাধীনতার আগেই ভারতের সাথে বাংলাদেশের বৈরিতা ও শত্রুতা সৃষ্টি হতো যার মোকাবিলা করা সেদিনের বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব হতো না। শেখ মুজিব তখন রাষ্ট্রোনায়োকোচিত দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচয় দেন।

আমাদের পূর্ব পুরুষদের ভিটামাটি তথা জন্মভূমি যে অখন্ড বাংলা তার পূর্ণ অঞ্চলের উপর আমাদের দাবী উত্তরাধিকার সূত্রে আইনসঙ্গত। জাতিসংঘের কাছে আমাদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবী তুলে ধরতে হবে। পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা, আসাম আমাদের মাতৃভূমির অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ভারত যেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে এ দাবী মেনে নেয় বিশ্ববাসীর কাছে সে দাবী জানাতে হবে। পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম ভাষা বাংলা এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম সমজাতিক জনগোষ্ঠি হচ্ছে বাঙালীরা (প্রায় .২৪কোটি)। আকারের দিক থেকে এবং গুনের দিক থেকে বিচার করলে বাংলাকে জাতিসঙঘের দাপ্তরিক ভাষা করতে হবে। এ দাবী তুলে ধরতে হবে আন্তরিকতার সাথে।

বিদেশে বাঙালী মাত্রই সজ্জন। এর একটা মনস্তাত্ত্বিক কারণ হলো স্বভাবগতভাবে পরনির্ভর বাঙালীরা বিদেশে গেলে নিঃসঙ্গ বোধ করে এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। দেশের ভেতরে অসংখ্য বাঙালী পরিবেষ্ঠিত অবস্থায় তারা নিজেদেরকে আবিস্কার করতে পারে না। বিশাল বাঙালী জনগোষ্ঠি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র বাঙালীর মন কেঁদে উঠে – মাতৃজঠর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র শিশু যেমন কেঁদে উঠে। নির্জলা নিষ্ফলা মরুভূমিতে কি

আকর্ষণ ? বাঙালী বর্জিত প্রবাস হলো মরুভূমি আর সে মরুর দেশে বাঙালীর আস্তানাগুলো হলো ছায়াময় মরুদ্যান।

ঢাকা কিংবা কলিকাতায় বসে নিজেদেরকে তারা চিনতে পারে না। কিন্তু দিল্লী কিংবা ইসলামাবাদ গেলেই আবিস্কার করে তারা এক ভিন্ন জাতি, স্বাজাত্যবোধ আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে নিজেদের কাছেই। ইউরোপে আমেরিকায় অবস্থানের সময় দুই বাংলার মানুষের মাঝে কোন পার্টিশান থাকে না। ধর্মবিদ্বেষের প্রাচীর তৈরী করেছিল শুধু স্বদেশে। পূর্বের বাঙালী কিংবা পশ্চিমের বাঙালী যখন বিদেশে পাড়ি জমায় তখন ১৯৪৭ এ নির্মিত বঙ্গ প্রাচীরটির কথা তারা ভুলে যায়। বাংলা-পর্টিশান কত শক্তিশালী, কত নির্মম, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। ইতিহাসের নিষ্ঠুর ক্রমাবর্তনে বাঙালীর সব ঐশর্য্য, সব রত্ন বিদেশীরা হরণ করেছে শুধু তার ভাষা ও সংস্কৃতি কেড়ে নিতে পারেনি। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানীরা যখন উর্দু ভাষা ও সংস্কৃতি জোর করে প্রবর্তন করতে চাইলো এই বাংলায় তখন সঙ্গে সঙ্গে দুর্বার প্রতিরোধের আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে। বাংলাভাষা তার নিজস্ব আসন ফিরে পেল। পশ্চিমবাংলায় হিন্দি ভাষা ও সংস্কৃতি হঠাৎ করে চাপানো হয়নি বরং ধীরে ধীরে সুকৌশলে 'শ্লো পয়জনিং' এর মত পশ্চিমবাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে হিন্দি ভাষা ও সংস্কৃতির বীজ। সে কারণে সেখানে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ার মত তাৎক্ষণিক কোন ভিত্তি তৈরী হচ্ছে না। তবে খুব ধীরে ধীরে হলেও প্রতিরোধ এর একটা চেতনা জাগছে।

পশ্চিমবাংলা আসলে বাংলাদেশেরই যমজ বোন । তাদের চেহারা, বর্ণ ও আদর্শ এক ও অভিন্ন। পশ্চিমবাংলা আজ ভারতের রুগ্ন সন্তান হওয়ার পরিচিতি লাভ করেছে। আর এই বাংলা পাকিস্তানের রুগ্ন সন্তান হওয়ার পরিচয় ঘুচিয়ে এখন বঙ্গবলয়ের অগ্রনায়ক হয়েছে। বিশ্ববাংলার সাংস্কৃতিক রাজধানী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে ঢাকা মাহানগরী। পুরো বঙ্গ জগতের ভাষা সংস্কৃতির পূণ্যতীর্থে পরিনত হয়েছে অতীতের বঙ্গ রাজধানী সোনারগাঁও সংলগ্ন এই বুড়িগঙ্গা পারের ঢাকা। এটা কম গৌরবের কথা নয়।

আমি আবারও বলছি শান্তি নিকেতনী কায়দায় পশ্চিমবাংলার মুক্তি আসবে না। এ লক্ষ্যে পৌছুতে গেলে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার এর মত ক্ষিপ্রতা, কৌশল ও সাহসিকতা দিয়ে দিল্লী সাম্রাজ্যবাদ এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।

আসাম যুগ যুগ ধরে বঙ্গ অর্ন্তভূক্ত একটি অঞ্চল - যার ভাষা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার একটা কথ্যরূপ বা প্রশাখা। আসামী গদ্য প্রায় বাংলা গদ্যেরই মত। হাজার বছর ধরে বাংলার সাথে এর এ সাদৃশ্য লক্ষ্য করছেন পর্যটক আর ইতিহাসবিদেরা।

'বঙ্গবাদ' তত্ত্বটি কি, এর ধ্যান-ধারণার উৎস কোথায়, বাঙালী জাতির নৃতাত্ত্বিক

শেকড় কোথায় ? এসব সম্পর্কে সকল শিক্ষিত বাঙালীকে সজাগ করে তুলতে হবে সবার আগে। প্রতিটি জাতির সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো নিজেদের ভূখন্ডগত অধিকার পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা এবং দেশের অখন্ডতাকে রক্ষা করা শেষ সীমানা পর্যন্ত। আমরা বাঙালীরা অতীত নিয়ে যত গর্ব, যত বড়াই অথবা যত বিলাপ করি বর্তমান নিয়ে তার সিকি ভাগও চিন্তা করি না, ভবিষ্যতের জন্য কোন বাস্তব কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করি না।

আমাদের সাধনা হওয়া উচিত বাংলার বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে। বঙ্গ সূর্যের তিনটি গ্রহ আজ কক্ষচ্যূত হয়ে ভাসছে ভারতীয় আকাশে। এ গ্রহ তিনটি হলো পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা আর আসাম রাজ্য। আসামকে অবশ্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাতটি রাজ্যে বিভক্ত করা হয়েছে – ঐক্যবদ্ধ আসাম এর স্বাধীনতার দাবীকে যাতে দূর্বল করা যায়। ভারতীয় কক্ষপথে ভাসমান গ্রহ তিনটিকে বঙ্গীয় কক্ষপথে ফিরিয়ে আনতে পারে একমাত্র বঙ্গবাদ। বঙ্গসূর্যের আকর্ষণ হবে অপ্রতিরোধ্য। এদের সঙ্গে নিয়ে "বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র" গঠনের প্রস্তাব পেশ করতে হবে জাতিসংঘের কাছে। এই বঙ্গীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ হবে এমন একটি আদর্শ কনফেডারেশন যার মডেল অতীতের ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান এ ছিল। সেই সম্মিলিত মহান জাতির হৃৎপিন্ড হবে আজকের "মুক্ত বাংলাদেশ।" আর দেহ হবে ভবিষ্যতের "যুক্ত বাংলা"। সদস্য মিত্র রাষ্ট্রগুলো হবে সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত। এর ফলে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের উপর কোনরূপ প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না, এক রাষ্ট্রের স্বার্থ অন্য রাষ্ট্র দ্বারা ক্ষুন্ন হবে না। পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা, আসাম এই তিনটি স্টেট মূল বাংলাদেশ ভূখন্ডের সাথে মিলে "বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র" বা সংক্ষেপে "বাংলা যুক্তরাষ্ট্র" গঠন করতে পারে – ইংরেজীতে যাকে বেঙ্গল কনফেডারেশন বলা হতে পারে । কেননা বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতি হচ্ছে এই –কনফেডারেশনের মূল ভিত্তি। আসামী গদ্য বাংলা গদ্যেরই একটি আঞ্চলিক রূপ বা প্রশাখা।

অদৃষ্টের খেলা বাঙালীর নিকট অতীতকে এমনই ভারাক্রান্ত করেছিল যে, বাঙালীরা বুঝতেই পারেনি – যে বিষয় নিয়ে বাঙালী হিন্দু–মুসলিম এর মধ্যে দাঙ্গা হলো তা কোন সর্ববঙ্গীয় বিষয় ছিল না – তা ছিল সর্বভারতীয় এবং সর্ব পাকিস্তান সংক্রান্ত বিষয় অর্থাৎ বঙ্গভূমিতে বঙ্গস্তান প্রতিষ্ঠা না করে হিন্দুস্তান আর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লড়াই চলছিল তখন। ব্রিটিশ–উত্তর ভারতবর্ষ কিভাবে শাসিত হবে, 'ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান" তত্ত্বের ভিত্তিতে না 'দ্বিজাতিতত্ত্বের' ভিত্তিতে এই নিয়ে ছিল ঝগড়া কংগ্রেস আর লীগের মধ্যে। এই ঝগড়ায় বাঙ্গালীর স্বার্থ অর্জনের বা রক্ষণের কোন ব্যাপার ছিল না কারণ বাঙালীর স্বার্থ রক্ষার কবজ ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান যাকে অনেক আগেই নেহেরু নাকচ করে দিয়েছিলেন এই লালরত্ন (জওহেরলাল অর্থ লালরত্ন) বাংলা, পাঞ্জাব আর কাশ্মিরকে রক্তে লাল করে দিয়েছিলেন মাউন্টব্যাটনের সাথে ষড়যন্ত্র করে। সর্বগ্রাসী বঙ্গবাদী গণআন্দোলন ছাড়া পশ্চিমাবাংলা, ত্রিপুরা ও আসাম এর পক্ষে ভারত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কঠিন হবে। বঙ্গবাদ এর সার্বজনীন স্বীকৃতি ও চর্চা চাড়া অন্য কোন এ্যাডভেঞ্চার অখন্ডবাংলার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারবে না – যেমন পারেনি নেতাজী সুভাষবসুর এ্যাডভেঞ্চার – চরম আত্মত্যাগ,

দেশপ্রেমথাকা সত্ত্বেও সুভাষবসুর সংগ্রাম সাধনা সাফল্যের পূর্ণতা পায়নি। কারণ তা সীমাবদ্ধ ছিল একজন নেতা ও তার বাহিনীর মধ্যে এবং জাপান নামক বিদেশী শক্তির যৌথ সংগ্রাম ও সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল ছিল। দেশকে স্বাধীন করার ব্যাপারে সামরিক অভিযান মূল আন্দোলন এর একটি কৌশলগত অংশ হতে পারে মাত্র। আসল শক্তি আসবে সার্বজনীন জাগর ন ও উত্থান থেকে – যার চালিকাশক্তি হবে একটি সত্যিকার আদর্শ বা মতবাদ এবং সঠিক নেতৃত্ব। আমাদের জন্য সেই আদর্শ হবে 'বঙ্গবাদ' যে তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সর্ববঙ্গীয় মুক্তির দুয়ার খুলে যাবে–সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মুক্তি। বঙ্গবাদী আন্দোলন বা বঙ্গবিপ্লব এর স্নায়ুকেন্দ্র হবে মূল মাতৃবাংলা অর্থাৎ ঢাকাকেই এই ঝুঁকিপূর্ণ নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব বহন করতে হবে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের জাতিগত রূপরেখা কি হবে তা নিয়ে মারামারি করে খুন হলো বাঙালীস্তানের মানুষেরা অথচ পাকিস্তান বা হিন্দুস্তান কোনটাই বাঙালীদের স্বদেশ নয়। একই বাংলার দুই অংশে অবাঙালীদের চাপিয়ে দেয়া দুইটি কৃত্রিম জাতীয়তার জোয়াল বয়ে বেড়ালো দুই বাংলার মানুষেরা। ১৯৭১ এ পূর্ব অংশের জোয়াল কাঁধ থেকে ফেলে দেয়া হয়েছে কিন্তু পশ্চিম অংশের জোয়াল এখনও পশ্চিমের বাঙালীদের কাঁধে আছে।

এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে উল্লখযোগ্য। সারা ভারতবর্ষে ব্যাপক দাঙ্গা শুধু বাংলা ও পাঞ্জাবেই সংঘটিত হয় কেননা এই দুইটি রাজ্যকেই শুধু রেডক্লিফের ছুরি দ্বারা দ্বিখন্ডিত করার কথা হয় এবং দ্বিখন্ডনের ভিত্তি ছিল একমাত্র সাম্প্রদায়িকতা। হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যদি পশ্চিমবাংলায় হিন্দুস্তান প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে তাহলে আমি বলবো সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি কেননা দেড় কোটি হিন্দু তো –পূর্ববাংলায় থেকেই গেল, তারা পূর্ববাংলায় ক্ষুদ্রাকার সংখ্যালঘু জনশক্তিতে পরিণত হলো। সকল হিন্দুকে যদি পশ্চিমবাংলা তথা পূর্ব হিন্দুস্তানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো তাহলে ঐ বঙ্গবিভাগের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যেতো । একইভাবে প্রায় দেড় কোটি বাঙালী মুসলমান বিভক্ত পশ্চিমবাংলার ভেতরে থেকে খুব ছোট সংখ্যালঘু শক্তিতে পরিণত হলো। পুরো দেড় কোটি মুসলমান বাঙালীকে যদি পার্টিশনের পর পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরা থেকে সরিয়ে পূর্ববাংলায় অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে আসা যেতো তাহলে ধর্মের ভিত্তিতে বঙ্গবিভাগের একটা সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যেতো। তৎকালীন পূর্ববাংলায় যেমন; 'পূর্ব হিন্দুস্তানেও ধর্মনিরপেক্ষতার কোন বালাই ছিল না। পূর্ব পাকিস্তান হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। 'পূর্ব হিন্দুস্তান' এর মৃত্যু ঘটিয়ে জন্ম নেবে স্বাধীন বৃহত্তর বাংলাদেশ! আমরা মোটেও মূল বাংলাদেশের সীমানা সম্প্রসারিত করতে চাচ্ছি না বরং আদি সীমানাটুকু পুনরুদ্ধার করতে চাই। একুশ শতকের নবীন সাহসী বাঙালী প্রজন্মের উপর এ মহান দায়িত্ব এসে পড়বে। সারাবিশ্বের পতনশীল মতবাদ মার্কসবাদ এর কবল থেকে উদ্ধার করা দরকার পশ্চিম বাংলা ও ত্রিপুরা রাজ্যকে। মার্কসবাদ বা কম্যুনিষ্ট মতবাদ এর স্থান দখল করবে 'গণতান্ত্রিক বঙ্গবাদ'। পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরার বাঙালীদের সামনে

সঠিক নেতৃত্ব নেই। জ্যোতিবসুর নেতৃত্বে সততা, দেশপ্রেম, সমাজবাদ সবই আছে। – নেই শুধু নির্ভেজাল গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকার, নেই নির্ভেজাল বাঙালী জাতীয়তাবাদ বিকাশের কোন প্রয়াস, নেই দ্রুত অর্থনৈতিক উত্থানের কোন প্রতিশ্রুতি। মার্কসবাদ আর মক্যুনিজম এর তত্ত্ব দিয়ে আর কতকাল ভুলিয়ে রাখা যাবে পশ্চিমবাংলার মানুষকে? বাস্তবভিত্তিক মুক্ত অর্থনীতির পথ দেখাতে হবে সে দেশের মানুষকে। আমাদের এ প্রচেষ্টায় মুক্ত বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক শক্তির সাহায্য ও সমর্থন পাওয়া যাবে। 'বঙ্গবাদ' বা 'প্যানবেঙ্গলিজম' এর বিস্তার মানেই স্বাধীন বাঙালী জাতীয়তাবদ ও গণতন্ত্রের বিস্তার। সমগ্র পূর্ব হিমালয় অঞ্চল জুড়ে অব্যাহতভাবে বিকশিত হবে 'বঙ্গবাদ', স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের পুষ্পকলি। ১৯৪৭ এর ঘটনাবলীর দ্বারা বাঙালীর আবহমান কালের জন্মভূমির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছিল মাত্র। বাঙ্গালীরা তখন প্রমাণ করেছে যে তারা আত্মঘাতী জাতি। ১৯৪৭ এর স্বাধীনতার পরবর্তী কিছুকালের মধ্যেই যখন পাকিস্তানী শাসকদের অত্যাচার ও ধর্ম–বিদ্বেষের ফলে বেশ কিছুসংখ্যাক বাঙালী হিন্দু উদ্বাস্ত হয়ে পশ্চিমবাংলায় গিয়ে এক অবহেলিত ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর মত ভাসতে লাগলো – তখন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পুনর্বাসনের জন্য প্রায় কিছুই করল না পক্ষান্তরে পাকিস্তানের পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আসা অবাঙালী শিখ উদ্বাস্তদের জন্য প্রায় সবকিছুই করলো। কারণ ভারত এর কেন্দ্রীয় সরকারে অবাঙালীর প্রাধান্য সুস্পষ্ট। কাজেই যে বাঙালী হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তানী মুসলিম সংখ্যাগুরু সরকারের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছিল এবং দেশ ত্যাগ করেছিল তারা সত্যিকার অর্থেই দুর্ভাগা ছিল। তারা ভারত এর কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারাও অবহেলিত হয়েছিল। অবাঙালী হলে তারা অবশ্যই সুন্দরভাবে পুনর্বাসিত হতো। ঋত্বিক ঘটকের বিখ্যাত ছবি "সুবর্ণরেখায়" এ ধরনের কিছু ছিন্নমূল উদ্বাস্ত হিন্দু বাঙালী পরিবার এর সীমাহীন দুঃখ দুর্দশার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। এপার ওপার কোথাও কোন ঠাঁই নেই এদের – নেই কোন আশ্রয় বা ভরসা।

আসলে আমরা যতদিন বিদেশী উপনিবেশবাদী প্রভু ব্রিটিশ জাতির অধীনে ছিলাম অখন্ড বাংলাদেশে এক জাতি হিসেবেই আমাদের জাতিগত পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বজায় ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সনে যখনই ইংরেজ এর হাত থেকে মুক্ত হলাম তখনই আর যুক্ত থাকতে পারলাম না। এক ইংরেজ জাতির হাত থেকে ছাড়া পেয়ে দুইটি আধা বিদেশী জাতির হাতে পড়লাম – পাকিস্তানী ও হিন্দুস্তানী এই দুই জাতির সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাদের বঙ্গস্তানী পরিচয় বিলুপ্ত হলো। বাঙালীর মূল সত্ত্বার এই যে আমূল বিলুপ্তি বা পরিবর্তন – তা কোন মহান বিপ্লব বা বিবর্তনের ফলশ্রুতি নয় – বরং সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গার ফলশ্রুতি। মাত্র দুই সপ্তাহের পাশবিক দাঙ্গা দুই হাজার বছরের গড়ে উঠা ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে দিল – বাংলা দুই টুকরা হয়ে গেল। কলিকাতা ও নোয়াখালীর দাঙ্গার মত খুব সাময়িক একটা সাম্প্রদায়িক হানাহানি একটি মহাজাতির মধ্যে চিরকালীন বিভেদের প্রাচীর তুলবে – এ আশংকা করা তৎকালীন বাঙালী হিন্দু নেতাদের (বিশেষত পশ্চিমবাংলার) পক্ষে ছিল একটি বিরাট ভুল ও আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। মূলত; তাদের ভোটেই ১৯৪৭ সনের জুন মাসে বঙ্গবিভাগ এর সর্বনাশা সিদ্ধান্তটি কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের লোকেরাই এই বঙ্গভঙ্গ

প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন ১৯০৫ সনে। কারণ অতীতের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের সাথে দ্বিজাতি তত্ত্বের কোন সম্পর্ক ছিল না। ১৯৪৭ সনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গোটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে গৃহীত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে হিন্দু বাঙালীরাই সবার আগে গ্রহণ করে। বাংলার ইতিহাস এর সবচেয়ে কলংকজনক, ও আত্মবিনাশী সিদ্ধান্ত ছিল এটা। তাদের শিশুসুলভ ও হাস্যকর যুক্তি ছিল – গোটা বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হলে বাংলার সকল হিন্দু মরবে আর শুধু পূর্ববাংলা তৎকালীন পাকিস্তানের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হলে শুধু পূর্ববাংলার হিন্দুরা মরবে – পশ্চিম বাংলার হিন্দুরা বাঁচবে, হিন্দুস্তানে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কারণে। সমগ্র অবিভক্ত বাংলা পাকিস্তানের মধ্যে গেলে সকল বাঙালী হিন্দু মরে যাবে, এ ধরনের উদ্ভট প্রচারণা চালাচ্ছিলেন হিন্দু মহাসভার নেতা ডঃ শ্যামা প্রসাদ মূখার্জী। পূর্ববাংলার হিন্দুরা বাঁচুক মরুক এ সম্পর্কে হিন্দু মহাসভার নেতাদের কোন মাথা ব্যাথা ছিল না। পরবর্তীতে কংগ্রেসের কণ্ঠস্বরও এক হয়ে যায় হিন্দু মহাসভার সাথে। এ সিদ্ধান্তের দ্বারা পশ্চিমবাংলার নেতাদের সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি প্রতিফলিত হয়, যা ছিল আঞ্চলিক স্বার্থে – এমনকি গোটা হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থেও নয়।

তৎকালীন 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যের সারমর্ম এই যে "নোয়াখালীর ব্যাপারে দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে গোটা বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হইলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুও বাঁচিবে না সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাঙালী হিন্দু ধ্বংস হইবে।" অথচ এই ঢালাও মন্তব্য যে কত ভুল তা প্রমানিত হয়েছে। পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা বেঁচেছিল। মরেছে বরং পশ্চিমবাংলার হিন্দুরা। সারা ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চাপে মাড়োয়ারী গুজরাটিদের শোষণে পশ্চিমবঙ্গ আজ ভারত এর রুগ্ন সন্তান আখ্যা পেয়েছে। একটু দূরদৃষ্টি থাকলেই তারা আঁচ করতে পারতেন যে গোটা বাংলা ১৯৪৭ সনে পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত হলে পাকিস্তানের এই পূর্বাঞ্চল তথা অখন্ড বাংলা স্বাধীন হয়ে যেতো ১৯৭১ এর অনেক আগেই হয়তো বা ১৯৬১ সনে। তখন এক ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক মহাজাতি হিসাবে বাঙালীরা বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতো। তাছাড়া নোয়াখালীর দাঙ্গা হয়েছিল কলিকাতার দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া হিসাবে। এর আগে কখনও নোয়াখালীতে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হয়নি।

একটা অতি সাময়িক খন্ডকালীন ঘটনাকে চিরস্থায়ী ঘটনা হিসাবে আশংকা করার কোন যুক্তি ছিল না। তাছাড়া পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ বিভাগ উত্তরকালে নোয়াখালী কুমিল্লা বা বাংলার অন্য কোন জেলায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর হামলা হলে তার প্রতিক্রিয়ায় ভারতের বিভিন্ন জেলায় সংখ্যালঘু মুসলমানের উপর হামলা হতে পারে এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার তথা বাংলা সরকার সর্বশক্তি দিয়ে দাঙ্গা প্রতিরোধ করতো। বাঙালীরা প্রগতিশীল, সমজাতিক এবং সমভাষিক জনগোষ্ঠি – যারা ঐতিহাসিকভাবে দাঙ্গায় অভ্যস্ত নয়। ১৯৪৬–৪৭ এর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছিল তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ইংরেজদের তৈরী করা এবং অবাঙ্গালী নেতাদের দ্বারা সমর্থিত।

কাজেই ইতিহাস ও বাস্তবতার নিরিখে সুস্থ মস্তিষ্কে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে

পশ্চিমবাংলার হিন্দু নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের আশংকা একেবারেই অমূলক ছিল। পলাশীর পর বাংলার ইতিহাসের এই দ্বিতীয় বৃহত্তম দুর্ঘটনা ও ট্রাজেডীর জন্য এরা দায়ী। সেই অমূলক আশংকার উপর ভিত্তি করে তড়িঘড়ি যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় (বঙ্গবিভাগের লক্ষ্যে) তাও ছিল ভুল। শুধু হিন্দু এম, এল, এরা ভোট দিয়েছিল বঙ্গবিভাগ এর জন্য, সাধারণ মানুষ ভোট দেয়নি। খুব নিরপেক্ষভাবে এবং স্বচ্ছভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নোয়াখালীর ঘটনার জন্য দায়ী কলিকাতার ঘটনা, আর কলিকাতার ঘটনার জন্য দায়ী গুজরাটের নেতা জিন্নাহর "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" এর নির্দেশ। মুসলিম লীগ হাইকম্যান্ড (যা জিন্নার হাতে ছিল) এর নির্দেশ ছিল 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালন করার জন্য ১৬ই আগস্ট ১৯৪৬ইং তারিখে'। কিন্তু সেই নির্দেশ স্পষ্ট ও পরিষ্কার ছিল না। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' কার বিরুদ্ধে? সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বলতে বুঝলো কংগ্রেস এর সাথে তথা হিন্দুদের সাথে সরাসরি সংঘাতে যাওয়া যার পরিণতিতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে গেল কলিকাতায়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' আনুষ্ঠানিকভাবে একটি বিশেষ ছুটির দিনে পালন করার আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল কি-না। খাজা নাজিমউদ্দীন প্রকাশ্যেই বলেছিলেন - " আমাদের সংগ্রাম ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুর বিরুদ্ধে।"

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে দেখতে হবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এর ঐতিহাসিক পটভূমি কি ছিল ? আসলে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের ঘোষণা নিয়ে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে যে তীব্র মতভেদ দেখা দেয় তারই ফলশ্রুতিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এর মত অনিয়মতান্ত্রিক সহিংস আন্দোলন এর জন্ম। লীগ ও কংগ্রেসের নেতৃত্ব ছিল মূলত জিন্নাহ্ এবং নেহরু এই দুইজন অবাঙালী নেতার হাতে। এই দুই সর্বভারতীয় সংগঠন এর বাংলা অঞ্চলের নেতারা শুধু তাদের নির্দেশ পালন করতেন অন্ধভাবে – নিজেরা কোন সিদ্ধান্ত দিতে বা সংশোধন করতে পারতেন না। তাহলে দেখা যাচ্ছে কলিকাতা দাঙ্গার জন্য প্রথমতঃ লীগ দায়ী দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেস দায়ী এবং তৃতীয়তঃ পরোক্ষভাবে হলেও ব্রিটিশ দায়ী। কংগ্রেস এর তৎকালীন সভাপতি লালরত্ন নেহরু (জওহেরলাল অর্থ লালরত্ন) ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের ১৯নং প্যারা এবং ১৫নং সাব–প্যারা মানতে রাজি হলেন না যদিও প্রথমদিকে কংগ্রেস ও লীগ উভয়ই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান মেনে নিয়েছিল। এটাকে এমন আকস্মিকভাবে প্রত্যাখ্যান করায় বাংলা ও ভারতের ইতিহাসে তিনি কালরতনে পরিণত হন যার ফলে মুসলিম লীগ ধৈর্য হারিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে গোটা ব্যাপারটির জন্য খন্ডিত ভারত এর হবু·প্রধানমন্ত্রী জওহেরলাল বা লালরত্ন দায়ী। এই লালরত্ন বাবু আসলেই ছিলেন অঘটন–ঘটন পটয়সী। হঠাৎ করে লালরত্ন নেহরু কর্তৃক ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান প্রত্যাখ্যান যেমন মেনে ছিল একটি হঠকারী সিদ্ধান্ত তার প্রতিক্রিয়ায় তড়িঘড়ি করে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করা ছিল একই ঘরনের একটি হঠকালী সিদ্ধান্ত যা মিস্টার জিন্নাহ নিয়েছিলেন। কাজেই কলিকাতা দাঙ্গার জন্য লালরত্ন আর জিন্নাহর মতবিরোধ প্রসূত একটি ভুল সিদ্ধান্ত দায়ী ছিল, যা শুধু ভারত বিভাগ নয় বঙ্গবিভাগকেও অনিবার্য করে তুলে। কাজেই দেখা যাচ্ছে– বাংলা বিভাগের জন্য এই দুই অবাঙ্গালী নেতা দায়ী। ভারত বিভাগের জন্য অবশ্য একা

নেহেরুর সিদ্ধান্তই যথেষ্ট ছিল। জিন্নাহ না থাকলেও এই লালরত্ন অবশ্যই ভারতকে দ্বিখন্ডিত করতো। "ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান" নাকচ হলে এমনিতেই দ্বিতীয় বিকল্প দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ অনিবার্য ছিল। একমাত্র লালরত্ন নেহেরুই নাকচ করেছিলেন ভারত সমস্যা সমাধান এর শ্রেষ্ঠ ফর্মূলা "ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান"কে – যার ফলে পরোক্ষভাবে দ্বিজাতিতত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হয় নেহেরু দ্বারা।

যেকোন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোকের মনে একটা বিষয় সংশয় এর সৃষ্টি করে আর তাহলো নেহেরু–জিন্নাহ্র মধ্যে এমন কোন গোপন সমঝোতা হয়তো ছিল যে, প্রথম জন ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান নাকচ করবেন আর দ্বিতীয় জন 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে' কল করে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যাতে দ্রুত বেগে ভারতবিভাগ না করে ব্রিটিশের হাতে আর কোন বিকল্প পথ খোলা না থাকে এবং হিন্দুস্তান–পাকিস্তান দুইটি আলাদা দেশ হলে তারা দুইজনেই দুইটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান হবেন এবং প্রদেশগুলোর উপর নিরংকুশ আধিপত্য বজায় রাখতে পারবেন – যেমন রেখেছিল পাকিস্তানের তথাকথিত শক্তিশালী করাচী ভিত্তিক কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলার উপর এবং হিন্দুস্তানের দিল্লী ভিত্তিক কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবাংলার উপর। কারণ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় শক্তিশালী কেন্দ্রের অস্তিত্ব ছিল না – প্রদেশগুলোর হাতে থাকতো সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন; 'বাংলা–আসাম' গ্রুপটি তৃতীয় আঞ্চলিক জোটে সবচেয়ে বেশি লাভবান হতো। পূর্ববঙ্গের কাঁচামাল, পশ্চিমবঙ্গের শিল্প কারখানা আর আসামের খনিজসম্পদ মিলে এক আদর্শ অর্থনৈতিক দেশ হিসেবে দ্রুত বিকাশ লাভ করতো বাংলা–আসাম। প্রকুতপক্ষে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান ব্যর্থ হওয়ার ঘটনা শুধু নেহরুকেই সাহায্য করেনি পরোক্ষভাবে মিঃ জিন্নাহও এর দ্বারা উপকৃত হন কারণ ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান এর একমাত্র বিকল্প ছিল দ্বিজাতিতত্ত্ব – যা জিন্নাহ পছন্দ করতেন। তাছাড়া ১৯৪৭ পরবর্তী ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের কেন্দ্রে বসে জিন্নাহ থেকে শুরু করে আইউব খাঁ, ইয়াহিয়া খাঁ পর্যন্ত এমন কেউ ছিলেন না যিনি 'শক্তিশালী কেন্দ্র', 'শক্তিশালী কেন্দ্র' বলে চিৎকার করেননি, যার কারণেই পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের প্রদেশগুলোর প্রতি বৈষম্য ও অবিচার বেড়ে যায় এবং সর্বত্র স্বায়ত্তশাসন এর দাবী প্রবল হয়ে উঠে – কোথাও কোথাও স্বাধীনতার দাবীও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতে আরো উঠবে– যেমন আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবাংলা, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু ইত্যাদি।

লালরত্ন নেহেরু এবং জিন্নাহ্ উভয়ই ছিলেন সুচতুর, পাশ্চাত্য পন্থী, উচ্চাভিলাষী এবং ক্ষমতাপ্রিয়। পক্ষান্তরে গান্ধী, আজাদ এরা ছিলেন ক্ষমতার মোহ থেকে মুক্ত, প্রাচ্যপন্থী, আদর্শবাদী এবং অসাম্প্রদায়িক ও শান্তিবাদী। তবে গান্ধী বা আজাদ কেউই স্বাধীন বাঙালী জাতীয়তাবাদ এর পক্ষে ছিলেন না তবুও মাওলানা আজাদই একমাত্র অবাঙালী নেতা যিনি সর্বান্তকরণে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানকে গ্রহণ করেন। দেশবন্ধুর মত দেবতুল্য ব্যাক্তিও গান্ধীর সাথে একত্রে কাজ করতে পারেননি পারিবারিক সমঝোতার অভাবে।

একথা খুবই সঠিক যে কলিকাতার দাঙ্গা বাঙালী জাতির মৃত্যুঘন্টা বাজিয়েছিল আর পাকিস্তানী হিন্দুস্তানী জাতিকে দিয়েছিল নবজীবন। ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট বাঙালী জাতির মৃত্যু দিবস আর পাকিস্তানী জাতির জন্মদিন। তার একদিন পর অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট হলো হিন্দুস্তানী জাতির জন্মদিন। তথাকথিত শক্তিশালী কেন্দ্রের ধ্যান-ধারণার কারণেই ভারতীয় ইউনিয়ন একদিন ভেঙে যাবে। পাকিস্তানও একসময় আংশিক ভাঙতে পারে- বিশেষ করে সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। এরা কেন্দ্রের বৈষম্য নীতির শিকার। একই সময়ে একই মাসে জন্মগ্রহণ করার ফলে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান' পারস্পারিক যমজ বোনের মত হয়েছে। চেহারা, বর্ণ, অবয়ব এক ও অভিন্ন। দুইটি জাতিই ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতি আর বর্ণের ককটেল। এর বিপরীতে বাংলার জাতীয়তাবাদ একই সমজাতিক জনগোষ্ঠি দ্বারা গঠিত। একই বর্ণ, একই সংস্কৃতি শুধু ধর্মের ভিন্নতা আছে - যা ভারতে আরো বেশি পরিমানে আছে। পূর্ণিয়া থেকে আকিয়াব, দ্বারভাঙ্গা থেকে শুরু করে আসাম এর শেষ সীমানা পর্যন্ত একই মহাজাতির অভিন্নতা। মহবাংলার সীমানার মধ্যে যে অভিন্নতা সামঞ্জস্য দেখা যায় তা মহাভারতের মধ্যে দেখা যায় না। ভিন্নতা ও অসামঞ্জস্যের প্রতীক হলো ভারতীয় জতীয়তাবাদ। কলিকাতার দাঙ্গা ও তার বিস্তারের জন্য প্রায় সকল বাঙালী হিন্দু লেখক ও ইতিহাসবিদ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে সরাসরি এককভাবে দায়ী করে থাকেন এবং মুসলিম লেখকরা বলেন- দাঙ্গার জন্য কলিকাতার কংগ্রেসপন্থী হিন্দুরাই মূলতঃ দায়ী। উভয়পক্ষের বিশ্লেষণই পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। দুই সম্প্রদায়ের লেখকদের কারোরই দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছও নিরপেক্ষ ছিল না। কারণ সবাই ছিলেন রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত। যেকোন ইতিহাসবিদ বা লেখককে অবশ্যই সত্যের পুজারী হতে হবে- সত্য যত কঠিন, যত অপ্রিয় হোক না কেন। আমরা বাঙালীরা অনেকেই মিথ্যাচার ও প্রতারণায় অভ্যস্ত। এই একটি ক্ষেত্রে বাংলার হিন্দু মুসলমানে কোন পার্থক্য নেই।

আমি ইতিপূর্বেই আমার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে বলেছি প্রথমতঃ মিঃ জিন্নাহর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের নির্দেশটি দায়ী। দ্বিতীয়তঃ জওহেররাল নেহেরু কর্তৃক প্রদত্ত ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান' প্রত্যাখ্যান করার অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক ঘোষণাটি দায়ী। এই ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ লীগ ও তার নেতা জিন্নাহ ঠিক করলেন যে যেহেতু নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন এর সকল প্রচেষ্টা, নিঃশেষিত হয়ে গেছে তখন 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শুরু করা ছাড়া তার হাতে আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। মিঃ জিন্নহর এ পদক্ষেপও ছিল অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতার পরিচায়ক। পরিণতি কি হতে পারে তা না ভেবে এ ধরনের বিপজ্জনক নির্দশ দিলে মহাবিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। একজন ডাক্তার এর ভুল প্রেসক্রিপশন যেমন রোগীর জীবনকে বিপন্ন করে তুলে তেমনি একজন প্রধান নেতার ভুল সিদ্ধান্তে গোটা জাতি বিপন্ন হয়।

বঙ্গবিভাগ, পাঞ্জাব বিভাগ, কাশ্মীর খন্ডন এমনকি ভারত বিভাগসহ সকল ঘটনার জন্য দায়ী কলিকাতা ও নোয়াখালীর দাঙ্গা - যা সংঘটিত হয় লালরত্ন নেহরু ও জিন্নাহর ভুল সিদ্ধান্তের ফলে। ভবিষ্যতের জাতীয় নেতাদের অনেক কিছু শিখবার আছে এ ঘটনা থেকে।

বিভক্তি বা পার্টিশন যে কি বেদনার তা কেবল বাংলা ও পাঞ্জাবই জেনেছে। অন্য রাজ্য বা প্রদেশগুলো অতটা টের পায়নি। অবশ্য কাশ্মীরও বিভক্তির বেদনা কিছুটা ভোগ করেছে। কারণ অন্য সব প্রদেশগুলোর ক্ষেত্রে সীমানা সম্পদ, জনবল, ভূমি ভাগাভাগির কোন প্রশ্ন ছিল না। যার ফলে মারামারি, হানাহানি তেমন একটা হয়নি। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্যণীয়। দেশ ভাগাভাগির সময়ে সেনাবাহিনী ও সেনা সরঞ্জাম ভাগ করতে গিয়ে দেখা গেল পাকিস্তানের ভাগে আর্মির যে অংশটুকু পড়লো তাতে পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বেলুচী সবই আছে শুধু বাঙালী অফিসার ও সৈনিক একেবারেই নেই – মুষ্টিমেয় যে ক'জন ছিল তা একেবারেই নগণ্য। কারণ ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে প্রথমে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল বাঙালীদের হাত থেকে এবং পরবর্তীতে মোগল মুসলমানদের হাত থেকে। এ কারণে বাঙালীদেরকে এরা যতটা অবিশ্বাস করতো ঠিক ততটাই ভয়ও করতো। অসামরিক দুর্বল জাতি বলে যাদেরকে ব্যাঙ্গ করেছে ইংরেজরা সেই বাঙালীদের কাছেই বহু খন্ড যুদ্ধে পরাজিত হয় তারা, পলাশীর আগে। বাংলার তৎকালীন প্রধান সেনাপতি মীর জাফর আলী খান বিশ্বাসঘাতকতা না করলে পলাশীর যুদ্ধেও তারা আবশ্যই পরাজিত হতো। এজন্যই পরবর্তীতে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিতে কোন বেঙ্গল রেজিমেন্ট খাড়া করতে দেয়নি ইংরেজরা এবং ১৯৪৭ এ ভারত ত্যাগ করার সময় লালরত্নকে এমন এক উপদেশ দিয়ে যায় মাউন্ট ব্যাটেন যেন ভবিষ্যতের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কোন বেঙ্গল রেজিমেন্ট খাড়া করা না হয়। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালীরাও যদি একটি আলাদা রেজিমেন্ট পায় তাহলে দিল্লির অবস্থা কাহিল হবে। সেই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা আজও বিদ্যমান ইন্ডিয়ান আর্মিতে – আজও সে দেশে কোন বেঙ্গল রেজিমেন্ট গড়ে তোলার অনুমতি দেয় না ! পাকিস্তানীরা অন্ততঃ পূর্ব বঙ্গের বাঙালীদেরকে বেঙ্গল রেজিমেন্ট গড়তে অনুমতি দিয়েছিল পাকিস্তান আর্মির অংশ হিসেবে – যে রেজিমেন্ট ১৯৬৫ সনের যুদ্ধে চরম বীরত্বের পরিচয় দেয় এবং পাঞ্জাবীদের শহর লাহোর রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল ভারতীয় বাহিনীর বিপরীতে।

প্রকৃতপক্ষে পার্টিশনের ঝড়টা গিয়েছে বাংলা ও পাঞ্জাবের উপর দিয়ে। বড় ধরনের দাঙ্গাও হয়েছে এই দুইটি অঞ্চলেই। কারণ এ দুটো রাজ্যকে কেটে দু'ভাগ করতে হবে। পূর্ব বাংলা রূপান্তরিত হলো পাকিস্তানে আর পশ্চিমবাংলা রূপান্তরিত হলো হিন্দুস্তানে অন্যদিকে পূর্ব পাঞ্জাব হিন্দুস্তানে ও পশ্চিম পাঞ্জাব পাকিস্তান এর মধ্যে পড়লো। ইতিহাস এর কি অমোঘ নিয়তি; একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাচীন জাতি ও দেশ তার পরিচয় হারিয়ে ফেললো ভিন্ন দুই নবাগঠিত জাতিসত্ত্বার মধ্যে – যে জাতিসত্ত্বা সদ্য বিকশিত এবং সম্পূর্ণ নবীন। পাকিস্তানী ও ভারতীয় জাতীয়তার কোন সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বা ভিত্তি নেই।

আমি আবার অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি আবেগ এর বশে – কেননা কথার পীঠে কথা আসে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব একেবারেই দায়ী নন একথা আমি বলছি না। তিনি যেহেতু মুসলিম লীগের সদস্য হিসাবে বাংলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন - সেহেতু লীগের সিদ্ধান্ত না মানা কিংবা তার বিরোধিতা করা হয়তো উনার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'

এর সঠিক কর্মসূচী কি হবে, তিনি আগে থাকতে দলীয় নেতা ও কর্মীদের বুঝিয়ে দিলে ভাল করতেন। "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে" সরকারী ছুটি ঘোষণা করা মোটেই সমীচীন হয়নি। তাছাড়া ইংরেজ পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার এরা দাঙ্গা দমনের লক্ষ্যে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। কারণ তারা যেহেতু ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাচ্ছে সেহেতু এদেশের অধিবাসীদের তারা বুঝাতে চেয়েছিল যে ইংরেজরা থাকতেই এ অবস্থা? তারা চলে গেলে হিন্দু মুসলমান শুধু মারামারি করে মরবে। তাদের তখনকার ভাবখানা ছিল 'ইংরেজ তাড়াবার মজা বুঝুক ভারতীয়রা'। ইংরেজ রাজকর্মচারীদের এ ধরনের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার জন্য সোহরাওয়ার্দী প্রশাসন কার্যকরভাবে দাঙ্গা দমন করতে পারেনি। আরেকটি বিচ্যুতি ছিল। পূর্ব প্রস্তুতি বা পরিকল্পনা না করা । এ ধরনের সন্ত্রাস যে হতে পারে সে সম্পর্কে পুলিশ স্পেশাল ব্রাঞ্চের রিপোর্ট থাকা উচিত ছিল প্রধানমন্ত্রীর হাতে।

তাছাড়া কলিকাতায় মিঃ গান্ধীর সাথে জনাব সোহরাওয়ার্দী বিভিন্ন দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় সফর করলেও নোয়াখালীতে তিনি একবারও যাননি। হেলিকপ্টার থেকে বিধ্বস্ত নোয়াখালীর অবস্থা তিনি কতখানি বুঝতে পেরেছিলেন তা সমালোচনার দাবী রাখে। বাংলার প্রধান মন্ত্রী নোয়াখালীর অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে গেলেন না – এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ছিল। অথচ গুজরাটের লোক হয়ে মহাত্মা গান্ধী মাসের পর মাস নোয়াখালীতে পায়ে হেঁটে, গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে, সাধারণ কুটিরে রাত্রিযাপন করে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হন। নোয়াখালীর দাঙ্গা বিধ্বস্ত হিন্দুদের অবস্থা স্বচক্ষে না দেখার জন্য যদি হিন্দু সম্প্রদায় বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পক্ষপাত দোষেদুষ্ঠ করেন তবে তাদেরকে খুব একটা দোষ দেয়া যায় না। দাঙ্গা চলাকালে মুসলমান পুলিশ সুপারকে বদলী করে নোয়াখালীতে আরেকজন ইংরেজ পুলিশ সুপার নিয়োগ করাই যুক্তিসঙ্গত কাজ হতো। এসব স্পর্শকাতর বিষয় জনাব সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকাকে কিছুটা বিতর্কিত করে তোলে। কিন্তু তা বলে কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হোক এটা তিনি নিশ্চয়ই চাননি। কারণ তিনি সবসময়ই বৃহত্তর বাংলার প্রবক্ত ছিলেন। হিন্দু মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট হলে বৃহত্তর বাংলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে না – এটাও তিনি জানতেন। কাজেই দাঙ্গা বাধলে হিন্দু মুসলিম ঐক্য নষ্ট হবে এবং বৃহত্তর বাংলা গঠনের সম্ভাবনা সুদৃঢ় পরাহত হবে, এটা কি তার মতো বিচক্ষণ একজন ব্যক্তি বুঝতে পারেননি ?

কলিকাতার দাঙ্গায় সংখ্যালঘু মুসলমানদের জানমাল রক্ষায় তিনি পুলিশকে বেশি কাজে লাগিয়েছেন। এ অভিযোগটিকে বিশ্বাস করা যায় কারণ তিনি নিজে মুসলমান ছিলেন। কিন্তু যেসব এলাকায় মুসলমানরা প্রবল ছিল এবং হিন্দুরা সংখ্যায় কম ছিল, সেসব এলাকায় দাঙ্গা দমন করার কাজে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় থাকতে আদেশ দিয়েছিলেন – এটা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না – এ অভিযোগটি ছিল অতিরঞ্জিত।

"প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" পালনের জন্য লীগ হয়তো তাৎক্ষণিক উস্কানি দিয়েছে কিন্তু

কংগ্রেসও যুক্তিহীনভবে লীগের সাথে মতবিরোধ সৃষ্টি করে পরোক্ষভাবে উস্কানি দিয়েছে লীগকে সহিংস আন্দোলনের পথে বেছে নিতে। "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" শুরু হওয়ার জন্য ইংরেজরাও দায়ী কেননা কংগ্রেস এর খামখেয়ালিতে তারাও তাড়াহুড়ো করে ভুল পদক্ষেপ নেয়। ১৯৪৬ সনের ২৪শে মার্চ ক্যাবিনেট মিশন দিল্লী আসে। কংগ্রেস ও লীগের সাথে প্রচুর আলোচনা সত্ত্বেও মিটমাটের কোন সম্ভাবনা না দেখে ১৬ই মে তারা একতরফাভাবে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের কাঠামো সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা এবং এর সংবিধান প্রণয়ণের ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা ঘোষণা প্রচার করলেন। ঐ ঘোষণার সারমর্ম হলো ঃ-

"ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ মিলে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে। কেবলমাত্র পররাষ্ট্র. দেশ রক্ষা ও যোগাযোগ (ডাক ও তারসহ) এই ৩টি বিষয় যুক্তরাষ্ট্রের হাতে থাকবে - অন্য সকল বিষয় প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্যগুলোর হাতে থাকবে। প্রাদেশিক বিধান সভার এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্যগুলোর দ্বারা নির্বাচিত ২৯৬ জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি কমিটি যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন করবে - এই সদস্যরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন।

ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশগুলো তিনভাগে বিভক্ত হবে যথাঃ- (১) পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলচিস্তান, (২) বঙ্গদেশ ও আসাম, (৩) অবশিষ্ট প্রদেশগুলো। প্রত্যেক প্রদেশের বিধানসভা এ প্রণালীতে নির্বাচিত হবার পর যে কোন প্রদেশ ইচ্ছা করলে সংযুক্ত ভারত রাষ্ট্র ত্যাগ করে স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করতে পারবে।" এ ঘোষণায় ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব করলেন যে, যে পর্যন্ত নতুন সংবিধান প্রস্তুত না হয় ততদিন যে সমুদয় দল এ ঘোষণার স্বীকৃতি দিয়েছেন সে সমুদয় দলের প্রতিনিধি নিয়ে বড়লাটের কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে।

১৯৪৬ সনের ৬ই জুন তারিখে মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে স্বীকৃতি জানালো। কংগ্রেস বড়লাটের অস্থায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদে যোগদান করতে রাজি হলো না কিন্তু সংবিধান প্রণয়ন সভায় যোগদান করতে সম্মত হলো। মুসলিম লীগ তখন দাবী জানালো যে, তাদের প্রতিনিধি নিয়েই বড়লাটের কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হোক। বড়লাট তাতে রাজি হল না। ক্যাবিনেট মিশন ঘোষণার কোন কোন অংশের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি তা নিয়েও কংগ্রেসও লীগের মধ্যে মতভেদ হলো। কিছুদিন বাকবিতন্ডা চলার পর মুসলিম লীগ ঘোষণা করলো যে তারা ক্যাবিনেট মিশনের ঘোষণার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করেছে। তখন বড় লাট কেবলমাত্র কংগ্রেস এর প্রতিনিধি নিয়ে তার কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করলেন। কংগ্রেস এর এ বিজয়ে সুসলমানরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো এবং ২৯শে জুলাই লীগ সিদ্ধান্ত নিল যে. ১৬ই আগস্ট তারা "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" পালন করবে। এর ফলে কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে ভয়াবহ দাঙ্গা. লুণ্ঠন ও হত্যাকান্ড করেকদিন যাবত অনুষ্ঠিত হলো - তা যেমন কলংকজনক তেমনি সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করলো বাংলা তথা গোটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে।

কাজেই দেখা যায় ক্যাবিনেট মিশন সংক্রান্ত কড়লাটের কিছু পদক্ষেপ মুসলমানদের ক্ষিপ্ত করে তুলে এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে তাদেরকে পরোক্ষাভাবে ধাবিত করে। কাজেই কলিকাতার দাঙ্গার জন্য জিন্নাহনেহেরুর লীগ কংগ্রেস এর মত ব্রিটিশ প্রশাসন ও সমভাবে দায়ী।

সেদিনের বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরওয়ার্দীর দাঙ্গাদমনে ব্যর্থতার কারণ তার "শ্যাম রাখি না কুল রাখি" অবস্থা; লীগ মন্ত্রিসভার প্রধান হয়ে লীগের স্বার্থ দেখবেন না নিরপেক্ষ প্রশাসনের স্বার্থ দেখবেন – এই দোটানায় পড়ে তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছেন। কিন্তু নোয়াখালীর দাঙ্গা দমনের ব্যাপারে তার ত্রুটি বিচ্যুতি সহজেই ধরা পড়ে কেননা ঐ অঞ্চলে মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগুরু এবং সে কারণে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী পক্ষ। কাজেই সংখ্যালঘু হিন্দুরা খুন জখম হয়েছে বেশি। শুরু থেকে বাংলার রাজনীতির সবচেয়ে বড় শূন্যতা বা ঘাটতি হলো – সর্ববঙ্গীয় কোন রাজনৈতিক দলের অনুপস্থিতি। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত যতগুলো রাজনৈতিক দল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছে তার কোনটিই সর্ববঙ্গীয় ছিল না – প্রায় সব কয়টি দলই ছিল সর্বভারতীয়। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় একসময় বলেছিলেন – "আমি কংগ্রেসীদের ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বুঝি না – আমি বুঝি বাঙালী জাতীয়তাবাদ", – এটা আসলে আবেগ এর কথা। কেননা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস কাজ করে যাচ্ছিল। আর পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নিখিল ভারত মুসলীম লীগ কাজ করছিল। এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের ইংরেজী নাম ছিল অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস ও অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ – এ রকম অল বেঙ্গল পার্টি কোনটিই ছিল না। কাজেই বাঙালী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পূর্ণ নিখিল বঙ্গভিত্তিক কোন জাতীয়তাবাদী সংগঠন ছিল না। শুধু শেরে বাংলার 'কৃষক প্রজাপার্টি, দেশবন্ধুর 'স্বরাজ পার্টি' আর নেতাজী সুভাস বসুর 'ফরোয়ার্ড ব্লক' এবং 'বাংলা পার্টি' বহুলাংশে বঙ্গভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ছিল। ভারত ইউনিয়ন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি অখন্ড স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র গঠন করাই যদি বাঙালী জাতির স্থির লক্ষ্য হয়ে থাকতো তাহলে বাঙালীরা কেউ মুসলিম লীগ বা কংগ্রেস করতো না। আসলে তখন গোটা বাঙালী জাতির কোন স্থির লক্ষ্য ছিল না। সস্তা ধর্মীয় আবেগে অন্ধ হয়ে তারা নিজ দেহকে দু'টুকরা করে ফেললো। মুসলিম লীগ যুক্ত বাংলা চেয়েছিল কিন্তু স্বাধীন বাংলা হিসেবে নয় – পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত একটি প্রদেশ হিসাবে । একইভাবে কংগ্রেস যুক্তবাংলা চেয়েছিল কিন্তু স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা হিসেবে নয় – হিন্দুস্তানের একটি প্রদেশ হিসাবে। উভয় সংগঠনের দৃষ্টিতে – গোটা বাংলাদেশ একটি প্রদেশ রূপে প্রতিভাত হয়েছিল, দেশ হিসেবে নয় – তা সে খন্ডই হোক আর অখন্ডই থাকুক। কিন্তু এমন একটিও নির্ভেজাল বাঙালী সংগঠন কি থাকা উচিত ছিল না যার চোখে বাংলা একটি পূর্ণাঙ্গ দেশ হিসাবে প্রতিভাত হতো ? আসলে স্বাধীন বঙ্গদেশ হিসাবে এদেশকে কেউ চায়নি। সে কারণেই বাংলা ও বাঙালীর দুরাবস্থা আজও দূর হয়নি। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস এর চিন্তাধারা দ্বিজাতিগঠন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল – ত্রিজাতিগঠন যে অতীব প্রয়োজনীয় ছিল সেদিকে তাদের চিন্তাধারা প্রসারিত হয়নি। কারণ তারা ক্যাবিনেট মিশন

প্ল্যান মানেনি–যদি মানতো তাহলে তখনই "বাংলা–আসাম" মিলে উপমহাদেশে তৃতীয় জাতির অস্তিত্ব বিকশিত হতো। "থ্রি ন্যাশন থিওরী" সত্য বলে প্রমাণিত হলো ১৯৭১ সনে। কাজেই ভারত উপমহাদেশ এর জন্য যা ঐ মুহূর্তে বাস্তব ছিল তা দ্বিজাতিত্ত্ব নয় বহু জাতি তত্ত্ব তখন ত্রিজাতি প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা রাজনৈতিক দিগন্তে দৃশ্যমান। 'হিন্দুস্তান', 'পাকিস্তান' এর মত আরেকটি তৃতীয় শক্তি 'বাঙালীস্তান' হয়ে তাদেরই পাশে সমান্তরাল মর্যাদার অবস্থান করুক – এটা কংগ্রেস বা লীগ কেউই চায়নি । এ রকম স্বাধীন সার্বভৌম দেশ গড়ার লক্ষ্যে বাঙালীদের কোন পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত ছিল না – যা ছিল তার নাম 'যুক্তিহীন আবেগ' এটাই ছিল বাঙালী জাতির অতীত নেতাদের সবচেয়ে বড় ভুল। পশ্চিমা নেতাদের লেজুড়বৃত্তি করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ ছিল না। মুসলমান বাঙালীর উচিত ছিল সর্বভারতীয় সাম্প্রদায়িক সংগঠন মুসলিম লীগকে বর্জন করা। কারণ তারা পরাধীন অবিভক্ত বাংলার কথা চিন্তা করতো। হিন্দু বাঙালীর উচিত ছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেসকে বর্জন করা করণ তারাও পরাধীন অবিভক্ত বাংলার কথাই চিন্তা করতো। বিভক্ত বাংলার কথা তখনই তাদের মনে আসে যখন এক বাংলার উপর দুই দেশেরই দাবী প্রবল হয়ে উঠে। বাংলার পূর্বখন্ড পাকিস্তান এর পরাধীন আর পশ্চিমখন্ড হিন্দুস্তান এর পরাধীন বাংলা হলো ১৯৪ সনে। আমরা পেলাম খন্ডিত – ওপার বাংলার স্টেটাস ও একই হয়ে গেল। যে দুইটি সর্বভারতভিত্তিক সংগঠনের অশুভ তৎপরতায় 'ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানে'র মত সুন্দর একটি ফর্মূলা বানচাল হয়ে যায় তাদেরকে বয়কট করে "বাংলা–আসাম" ভিত্তিক একটি বিশাল সংগঠন গড়ে তোলা উচিত ছিল এবং দুই নং গ্রুপিং অনুযায়ী বাংলা–আসাম ভিত্তিক একটি রাষ্ট্রীয় গ্রুপ তৈরী করা উচিত ছিল এবং তারপর সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করে ভারত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত ছিল–তার ফলশ্রুতিতে জন্ম নিত বিশ্বের বুকে এক বিশাল বাংলাভাষাভিত্তিক জাতিসত্ত্বা – স্বাধীন সার্বভৌম অখন্ড বাংলা যার ভেতরে অবশ্যই আসাম অঞ্চল থাকতো অতীতের মত, যেমন ছিল ১৮৭৪ সনের আগে। ঐতিহাসিকভাবে 'আসাম' বাংলার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইংরেজরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ১৮৭৪ সনে একটি গেজেট নোটিফিকেশন জারী করে 'আসাম' প্রদেশ সৃষ্টি করে। এর পূর্বে আসাম চিরদিন বঙ্গদেহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল, যেমন ছিল আরাকান ১৯৩৭ এর আগে। ১৮৭৪ সনে বাংলারই সুরমা উপত্যাকার গোটা অঞ্চলকে 'আসাম' নাম দিয়ে বাংলার বিশাল আকারকে কেটে ছোট করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য আসাম চিরদিনই বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অধীনে ছিল – এমনকি বঙ্গভঙ্গের পরও আসামকে পূর্ববঙ্গ প্রদেশের অংশ হিসেবে রাখা হয়েছিল। আসলে ঐ বিশেষ সময়টিতে আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজ তাড়ানো। আর কিছু আমরা চিন্তা করিনি। সারা ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ তাড়ানো আর বাংলা থেকে ইংরেজ তাড়ানো কোন অবস্থাতেই এক বিষয় ছিল না। ইংরেজ চলে যাবার পর যে বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হবে তা শুধু কংগ্রেস আর লীগ নেতৃত্ব যে পুরণ করতে পারবে না এ সত্যটি আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়। পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলের শূন্যতা পুরণ এর জন্য বিকাশমান বাঙালী নেতৃত্বের এগিয়ে আসা উচিত ছিল। কারণ এতদাঞ্চল মোগল আমলেও প্রায় চারশত বছর দিল্লীর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা নিয়ে বিরাজ করতে পেরেছিল বাঙালী নেতৃত্বের অনুপস্থিতির কারণেই

ইংরেজ এর কাছ থেকে স্বাধীন হবার পরও আবার ২৫ বছর পরে অবাঙালীদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে জবীন দিতে হলো। আমরা স্বাধীন হতে পারলেও ত্রিপুরা, আসাম, পশ্চিমবাংলা এখনও অবাঙালীদের হাত থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সম্ভবতঃ আরো হাজার হাজার বাঙালীকে ও ভবিষ্যতের তৃতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ দিতে হবে। প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল ইংরেজ এর বিরুদ্ধে, দ্বিতীয়টি ছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আর তৃতীয়টি হবে হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে পশ্চিম বাঙালী ও আসামীদের মুক্তি সংগ্রাম। এই তৃতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম হবে অমুক্ত বাংলাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এবং মূল বাংলাদেশ ভূখন্ডের সাথে যুক্ত করার আদর্শে। বাংলা মিত্ররাষ্ট্র, কিংবা আরো সংক্ষেপে প্রস্তাবিত বাংলা কনফেডারেশন গঠনের জন্য মাতৃবাংলার পশ্চিমাংশ পশ্চিমবাংলা এবং পূবাংর্শ ত্রিপুরা–আসামকে। আহ্বান জানাতে হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এর পর্যায়ক্রমিক তিনটি স্তরের মধ্যে প্রথম দুইটি স্তর আমরা সাফল্যের সাথে অতিক্রম করেছি – একটি ইংরেজ এর হাত থেকে – অপরটি পাকিস্তানীদের হাত থেকে। যে স্তরটি বাকি আছে তা ওপার বাংলার বাঙালীদের জাতীয় সংগ্রাম যা হবে হিন্দুস্তানীদের বিরুদ্ধে। ওরা চাক বা না চাক আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বসংস্থার কাছে দাবী জানাতে হবে যে কলিকাতা ও পশ্চিমবাংলা ঐতিহাসিকভাবে আমাদেরই অংশ। এটা হবে ৪র্থ স্তরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন যা কোন সংগ্রাম বা যুদ্ধ নয় – শুধু শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার। অর্থাৎ জনসাধারণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন হিসাবে বাংলাদেশের সাথে পশ্চিমবাংলা আসাম এর কনফেডারেশন গঠন।

একটি জাতির ট্র্যাজেডী বা বেদনাদায়ক দুর্ভাগ্য তখনই নেমে আসে যখন একটিমাত্র শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বিশেষ এর ভুলের কারণে অর্থাৎ একজন মাত্র জাতীয় নেতার পক্ষপাতিত্বমূলক পদক্ষেপের কারণে গোটা জাতি আত্মকলহ বা গৃহযুদ্ধ লিপ্ত হয়। ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের বাস্তবায়ন নিয়ে বড়লাটের স্বেচ্ছাচারিতা, কখনও কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে লীগের সঙ্গে আঁতাত, আবার কখনও লীগকে বাদ দিয়ে কংগ্রেস এর সাথে কার্য নির্বাহী পরিষদ গঠন, ইত্যাদি কার্যকলাপ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পারিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস এর সৃষ্টি করে। সর্বোপরি নেহেরু কর্তৃক ক্যাবিনেট মিলন প্ল্যান বাতিল লীগকে সহিংস আন্দোলন তথা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' এর পথে ঠেলে দেয় কাজেই "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" এর অতিপ্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার ফলেও যদি কলিকাতা দাঙ্গা হয়ে থাকে তবে তার জন্য জিন্নাহ যতোখানি দায়ী তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি দায়ী লালরত্ন নেহেরু এবং সাদারত্ন বড়লাট সাহেব। সোহরাওয়ার্দীও দায়ী। তবে তিনি দায়ী সবার শেষে অর্থাৎ চার নাম্বারে। এ ব্যাপারে এক নম্বর আসামী হলেন লালরত্ন নেহেরু – যার আকস্মিক হঠকারী সিদ্ধান্ত মিঃ জিন্নাহর "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" এর জন্ম দেয়। এই জঘন্যতম কুটিল কংগ্রেস সভাপতি বাংলার ঐক্য নষ্ট করেছে সবার আগে। বল্লভভাই প্যাটেল তার সহযোগী ছিলেন। তারপর দুই নম্বর আসামী হলেন বড়লাট স্বয়ং যা কারলে লীগ হিংসাত্মক কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হতে পারে তা জেনেও তিনি তাই করলেন। মিঃ জিন্নাহ

দায়ী তিন নম্বরে। কেননা, তিনি ধৈর্য্যধরে অপেক্ষা করতে পারতেন এবং গন্ধীর মত অহিংস আন্দোলনে যেতে পারতেন। শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পন্থা শেষ হয়ে গেছে এবং তাকে পিস্তল হাতে তুলে নিতে হবে- এধরনের শিশুসুলভ ও উস্কানীমূলক বিবৃতি থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারতেন। একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা বা রাষ্ট্রনায়ক কখনও সংযম হারান না। এর ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি হয়তো কিছুটা বিলম্বিত হতো কিন্তু এতে কলংকজনক রক্তাক্ত অধ্যায় সৃষ্টি হতে পরতো না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ১৯৪৭ এর বদলে ১৯৫০ সনে হলেও ক্ষতির কোন কারণ ছিল না। তাড়াহুড়া করতে গিয়ে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল সমগ্র ভারত বর্ষের বিশেষতঃ বাংলার। কলিকাতা-দাঙ্গা হতো না যার ফলে নোয়াখালীর দাঙ্গাও হতো না, এবং সবচেয়ে বড় কথা, বাংলার অখন্ডতার এমন অকালমৃত্যু ঘটতো না।

একটা কথা আমি হলফ করে বলতে পারি। জনাব সোহরাওয়ার্দী যদি মুসলিম লীগ না করতেন এবং বঙ্গবিত্তিক কোন দল গঠন করতেন তবে হিন্দুসহ সকল বাঙালীর আস্থা অর্জন করতে পারতেন অর্থাৎ যদি তিনি ক্ষমতার লোভ বির্সজন দিয়ে লীগ মন্ত্রীসভার প্রধানমন্ত্রী না হতেন এবং শরৎবসুও যদি কংগ্রেস না করতেন এবং সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার সদস্য না হতেন তবে উভয়ই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙালীর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারতেন।

ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বাংলার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বসু-সোহরাওয়ার্দী পরিকল্পনা অত্যন্ত বাস্তবধর্মী, সুন্দর ও সার্বজনীন ছিল। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী ও শরৎবসু দুই নেতা দুই ভিন্ন রাজনৈতিক দলের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন - যে দুইটি দলের শেকড় ছিল গুজরাটে - বাংলায় নয়। এই দুই ব্যাক্তিত্ব রাজনৈতিকভাবে নিজেরাই বিভক্ত হয়ে কিভাবে আশা করেছিলেন যে তারা অবিভক্ত বঙ্গগঠনে সমগ্র বাঙালী জাতির মধ্যে প্রেরণা ও জাগরন আনতে সফল হবেন ? ঘটনাক্রমে সোহরাওয়ার্দী সাহেব, আবুল হাশিম এরা এমন একটি দলের (মুসলিম লীগ) সদস্য ছিলেন যে দল ধর্মের ভিত্তিতে "মুসলিমস্তান" অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়তে চায় এবং শরৎবসু কিরণ শঙ্কর রায় এমন একটি দলের (কংগ্রেস) সদস্য ছিলেন যে দল "হিন্দুস্তান" অর্থাৎ ভারত রাষ্ট্র গড়তে চায় যা সিকিউলার হলেও মূলতঃ হিন্দুরাষ্ট্র হতে যাচ্ছে (হিন্দুদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে) এই চারজনের কেউই এমন কোন দলের প্রতিনিধিত্ব করেননি যে দল শুধু স্বাধীন সার্বভৌম বাঙালীস্তান চায়। বাংলার নেতারা বিশুদ্ধ বঙ্গীয় প্রতিষ্ঠান গড়তে ব্যর্থ হয়েছিলেন। একমাত্র শেরেবাংলার কৃষক প্রজাপার্টি ও নেতাজীর "বাংলা পার্টি" ছাড়া আর কোন দলকে বিশুদ্ধ বঙ্গীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া যায় না। কিন্তু তখন এই দুই ব্যক্তি ছিলেন ক্ষমতার বলয় থেকে অনেক দূরে - নেতাজী জাপানে এবং শেরে বাংলা যুক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে অনেক দুরে।

যাক, ব্রিটিশরাজ কর্তৃক তৈরী করা উপমহাদেশীয় দুই দৈত্যের (পাকিস্তান-হিন্দুস্তান) পাশাপাশি বাংলাদেশ যদি তিন নম্বর দৈত্যে পরিণত হতে ব্যর্থ হয় তবে তা হবে গোটা

বাঙালী জাতির জন্য চরম বিপদের কারণ। ভারতীয় শাসন-শোষণ আর সাংস্কৃতিক অভিযান এর ঠেলায় পশ্চিমবাংলা আজ প্রায় বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছে। অসম আর পশ্চিম বাংলাকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশ কিছুকেই তিন নম্বর দৈত্যে পরিণত হতে পারবে না। ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পর জনাব সোহরওয়ার্দী পূর্ব বাংলায় এসে যে আওয়ামী লীগ গঠন করলেন তা যদি উনি ১৯০৬ সনে গঠন করতেন কলিকাতায়, সর্ববঙ্গীয় দল হিসেবে যখন ঢাকায় নবাব সলিমউল্লাহ মুসলিম লীগ দল গঠন করলেন সর্বভারতীয় দল হিসেবে, তাহলে অবিভক্ত বাংলা বিভক্ত হতো না বরং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচয় পেতে। ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান যা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক কাঠামো হিসেবে আজও বাস্তবায়িত হতে পারে ভবিষ্যতের "বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের" শাসন কাঠামোর মধ্যে-যার মধ্যে "বাংলা-আসাম" এর স্টেটগুলো সর্বাধিক স্বায়ত্ত্বশাসন নিয়ে থাকতে পারবে - যে স্বায়ত্ত্বশাসন তারা দিল্লীর কাছে স্বপ্নেও প্রত্যাশা করতে পারে না - অন্য রাজ্যগুলোও দিল্লীর শক্তিশালী কেন্দ্রের বৈষম্য ও ভেদ নীতির শিকার।

একটা কথা এখানে উল্লেখ না করলে চলবে না। বর্তমান জার্মান জাতিকে প্রথমে জাগাবার জন্য এবং পরবর্তীতে দুই জার্মানীকে একত্রিত করার জন্য অন্ধভাবে জার্মান জাতীয়তাবাদ প্রচার করার প্রয়োজন হয়েছিল। প্যান জার্মানিজম ছাড়া হিটলার কিছুতেই মাত্র চার বছরে জার্মান জাতিকে অগ্রগতির চরম শিখরে পৌছে দিতে পারতেন না।

সেজন্যই বাঙালী জাতিকে দ্রুত বেগে জাগাবার জন্য প্যান বেঙ্গলিজম এর প্রচার ও আন্দোলন এর প্রয়োজন সর্বাধিক। বিজাতীয়রা যদি প্যান বেঙ্গলিজম বা "বঙ্গবাদ"কে অন্ধ জাতীয়তাবাদ বা সংকীর্ণ আঞ্চলিকতার আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করে তাতেও আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরা দেখবো আমাদের জাতীয় স্বার্থে। বায়ান্ন থেকে বাষট্টি পর্যন্ত বাংলাভাষা সংস্কৃতি ও জাতীয়তার উত্থানকে পাকিস্তানীরা বলতো প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিকতা। পূর্ববাংলার মানুষের সর্বাধিক স্বায়ত্ত্বশাসন এর দাবী ও আন্দোলনকে তারা বলতো ভারতীয় এজেন্টদের সৃষ্ট এক রাজনৈতিক চক্রান্ত যার ফলে ইসলাম বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আজ যদি পশ্চিম বাংলায় স্বায়ত্তশাসনের দাবী প্রবল হয়ে উঠে - (যে ধরনের স্বায়ত্ত্বশাসনের প্রতিশ্রুতি "ক্যাবিনেট" মিশন প্ল্যান" এ ছিল) তাহলে দিল্লীর হিন্দুস্তানীরা বলবে - এটা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিকতার আন্দোলন এবং বাংলাদেশী এজেন্টদের সৃষ্ট এক রাজনৈতিক চক্রান্ত - যার ফলে গোটা হিন্দু-ধর্ম ও সভ্যতা বিপন্ন হয়ে পড়বে। সব উপনিবেশবাদী এক সুরেই কথা বলে।

বাঙ্গালী নেতারা ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ এই গুরুত্বপূর্ণ দশকে মুসলিম লীগ আর কংগ্রেস এর মায়া কাটাতে পারলো না। এটাই হচ্ছে বাঙালীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডী। ১৭৫৭ থেকে ১৯৩৭ (বৃটিশদের রাজত্ব কালের) এই একশত আশি বছর যাবত বাঙালী হিন্দু মুসলমান এক বাংলা একজাতি হিসাবে থাকতে পারলো আর ব্রিটিশদের

বিদায়ের সময় মাত্র দশ বছর (১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭) হিন্দু মুসলমান এই বাংলায় সহাবস্থান করতে অপারগ হলো – এটার ঐতিহাসিক পটভূমি অবশ্যই বাঙালীদেরকে জানতে হবে। হঠাৎ করে আমাদেরকে বড় বড় নেতারা জানালেন বা শেখালেন যে বাংলায়, পাঞ্জাবে এমন কি সারা ভারতবর্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বসবাসরত হিন্দু মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি। নেপাল, বার্মা ও শ্রীলংকার হিন্দু মুসলমান কি দুইটি পৃথক জাতি? অথবা মালয়েশিয়ার খৃষ্টান ও মুসলমানরা কি দুইটি পৃথক জাতি? ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান, বৌদ্ধ, হিন্দু কি তিনটি পৃথক জাতি? দ্বিজাতিতত্ত্ব কি শুধু ভারতবর্ষ আর বঙ্গদেশ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? আসলে এটা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ উপহার। অতীতের কলোনীকে খন্ডিত রাখতে পারলে ভবিষ্যতেও প্রভাব প্রতিপত্তি খাটানো যাবে। ব্রিটিশদের খামখেয়ালীপূর্ণ সিদ্ধান্তে দাঙ্গা শুরু হল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা সাড়ে পাঁচশত বছরের মুসলিম শাসনামলেও কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত হয়নি। এটা আসলে ধর্মের ব্যাপারে নয় – জাতিভেদের ব্যাপার। এক সময়ে অবাঙালী মুসলিম মোগল এবং হিন্দু মাড়োয়াড়ীরা হাত মিলিয়েছিল বাংলার সম্পদ লুট করার ব্যাপারে, বাঙালীকে শোষণ করার ব্যাপারে অবাঙালীরা এক হয়ে গিয়েছিল (হিন্দু–মুসলমান নির্বিশেষে)।

বাঙালীর নিজস্ব জাতীয় সংগঠন যদি থাকতো তবে কখন কি করতে হবে তার জন্য মুসলিম লীগ হাই কম্যান্ড বা কংগ্রেস হাই কম্যান্ডের কাছ থেকে উপদেশ নিতে হতো না। নিজেরাই নিজেদের পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারতো। এই শূণ্যতা হচ্ছে বাংলার ইতিহাস এর সবচেয়ে বড় শূণ্যতা – যা অদূরভবিষ্যতে অবশ্যই পূরণ করতে হবে বাঙালী জাতিকে নতুবা এই মহাজাতির অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে, অন্ততঃ পশ্চিম বাংলাদেশের মানুষের বাঙালীত্ব যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ভাবতে অবাক লাগে আবুল হাশিমের মত সংস্কারমুক্ত, সমাজবাদী, প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক নেতা ও মুসলিম লীগের সদস্য হওয়াটাকে পরিহার করতে পারেননি। শরৎ বসু ও প্রশ্নাতীতভাবে মহৎ উদার ও প্রগতিশীল ছিলেন। সমগ্র বাঙালী জাতির ঐক্যের জন্য সারাজীবন এক নীতিতে অটল থেকে তিনি যে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছিলেন সেটা আর কেউ পারেননি। কিন্তু এ রকম একজন অসাম্প্রদায়িক সমাজবাদী নেতা ও ছিলেন কংগ্রেস এর সদস্য – যা ছিল একটি সর্বভারতীয় সংগঠন – সর্ববঙ্গীয় নয়। লীগ এবং কংগ্রেস সামন্তবাদীও ডানপন্থীদের এর প্রতিভূ হিসাবে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আসরে নেমেছিল। সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দেশপ্রেম, সততা ও নির্ভেজাল বাঙালী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এবং সর্বোপরি অবাঞ্ছিত পার্টিশন ঠেকানোর প্রয়াসে বামপন্থী সমাজতন্ত্রীরাই সবচেয়ে বেশি আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এর ব্যাপারে একমাত্র আন্তরিক ভূমিকা রেখেছিলেন মাওলানা আজাদ। তিনি ভারত উপমহাদেশের রাজ্যগুলোকে সবচেয়ে বেশি স্বায়ত্তশাসন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীন থাকার অধিকার দেয়ার পক্ষে ছিলেন – যা ছিল ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান এর মূল লক্ষ্য। ভারতের স্বাধীনতার দুইমাস আগে নিখিল ভারত কংগ্রেস এর দিল্লী অধিবেশনে ভারত বিভাগের বিরুদ্ধ মাত্র ২৯ জন ভোট দেন। ১৫৭ জন

ভারত বিভাগের পক্ষে ভোট দেন। অর্থাৎ কংগ্রেস বিপুল ভোটাধিক্যে দেশ বিভাগ এর পক্ষে প্রস্তাব পাস করেছিল। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির অরুনা আসফ আলী এবং বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের সুশীল দেব। ঐ অধিবেশনে এই দুইজনই একমাত্র ভারত বিভাগের বিপক্ষে কথা বলেছিলেন।

মিঃ জিন্নাহ ও তার লীগ সংগঠন ভারত বিভাগ চাইতেন কিন্তু বাংলা-বিভাগ ও পাঞ্জাব-বিভাগ চাননি। এটা কিছুটা স্ববিরোধী মনে হলেও এর মধ্যে একটা বিরাট মানবিক ব্যাপার ছিল। অর্থাৎ তিনি চাইতেন একই রাজ্যকে দু'টুকরা না করে গোটা রাজ্য পাকিস্তানে যাবে অর্থাৎ গোটা বাংলা পাকিস্তানে গেলে গোটা পাঞ্জাব ও যাবে। এদিক দিয়ে জিন্নাও নেহেরুর চেয়ে অনেক বেশি দূর দৃষ্টিসম্পন্ন, যুক্তিবাদী ও উদার ছিলেন। যে যুক্ত বাংলা মিঃ জিন্নাহ চেয়েছিলেন ইতিহাস এর পুনরাবৃত্তি তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে বলেই আমার বিশ্বাস। পুরো ভারতবর্ষ আবার ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানকেই পুনরায় গ্রহণযোগ্য মনে করতে পারে - আসাম, ত্রিপুরা, তামিলনাড় খালিস্তান, কাশ্মীর ও কর্ণাটক এর অবস্থা দেখেই তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। একটা কথা উল্লেখযোগ্য। চার্চিল এবং মাউন্টব্যাটনের চাপে পড়ে বংলা ও পাঞ্জাব-বিভাগ শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেও এ বিষয়ে জিন্নাহ সাহেব কখনও লিখিত সম্মতি দেননি। চরিত্র ও দৃঢ় মনোভাব এর দিক থেকে তিনি অন্তত নেহেরুপ্যাটেল এর চেয়ে অনেক উপরে ছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার পরিবারে কেউ জিন্নাহ বংশকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখতে সচেষ্ট হননি। অথচ নেহেরুর মৃত্যুর পর বংশানুক্রমিকভাবে তার পরিবারের সদস্যরা নেহেরু ডাইনেষ্টিকে কায়েম করে দিল্লীতে জাঁকিয়ে বসে। যেখানে নেহরু প্রায় একনায়ক হয়ে গিয়েছিলেন সেখানে হিন্নাহ অনেক বেশি গণতান্ত্রিক ছিলেন। পাকিস্তানের শুরুতে বাংলাকে অবিভক্ত রাখার ব্যাপারে মিঃ জিন্নাহ লর্ড মাউন্টব্যাটনের সাথে রীতিমত ঝগড়া করেছিলেন। তার এ ভূমিকা অবশ্যই রাষ্ট্র নায়কোচিত ছিল।

সেই অস্থিরতার যুগে (১৯৩৫ থেকে ১৯৪৭) বাংলার হিন্দুরা লাইন দিলেন গুজরাটের গান্ধীর পেছনে আর বাংলার মুসলমানরা লাইন দিলেন গুজরাটের জিন্নাহর পেছনের উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালী জাতির জন্য গুজরাট হয়ে গেল রাজনৈতিক তীর্থভূমি। তাহলে দেখা যাচ্ছে দূর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলার নেতৃত্ব গুজরাট থেকে নিয়ন্ত্রিত হতো। অথচ বাংলার সীমানার মধ্যেই এমন পর্যায়ের বিশুদ্ধ বাঙালী জাতীয় নেতা ছিলেন যারা মেধা ও যোগ্যতায় গান্ধী, জিন্নাহ, নেহেরু আজাদ ইত্যাদির চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না। যেমন দেশবন্ধুর, শেরেবাংলা, নেতাজী এমনকি সোহরাওয়ার্দী, শরৎবসু, আবুল হাশিম এদের মধ্যে যে কোন একজনকে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সর্বজনীনভাবে গোটা বাঙালী জাতির নেতা হিসাবে মেনে নিলে বাংলা দ্বিখন্ডিত হতো না - এমনকি স্বাধীন, সার্বভৌম মর্যাদা নিয়ে বিরাজ করতো।

চট্টগ্রামের জে. এম সেনগুপ্ত বাংলার নেতাজিকে সমর্থন না দিয়ে গুজরাট এর

গান্ধীকে সমর্থন দিয়েছিলেন। মাওলানা আকরাম খাঁ, খাজা নাজিমউদ্দিন স্বদেশী শেরে বাংলাকে সমর্থন না করে গুজরাটের জিন্নাহকে সমর্থন করেছিলেন। এ রকম পরসেবী ও পরপুজারী জাতি বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি আছে বলে মনে হয় না। দাসত্বসুলভ মনোভাব থেকে এ প্রবণতার সৃষ্টি হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরশাসিত, পরিশোষিত ও পরচালিত এ জাতি সর্ববিষয়েই পরনিভরশীল – আত্মবিশ্বাস একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিল অন্ততঃ ঐ সময়ের জন্য অর্থাৎ ১৯৩৫–১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যুগটি ছিল বাংলার ইতিহাসের অন্ধকার যুগ। শুধু ভূখন্ড নয়, বাংলার সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জাতীয়তা সবই দ্বিখন্ডিত হয়েছিল, রেডিক্লিফ ও মাউন্টব্যাটনের হাতে। যাদেরকে লালরত্ন নেহেরুই প্ররোচিত করেছিলেন। সাদারত্ন চার্চিল প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করলেন মিঃ জিন্নাহর উপর (যিনি কিছুতেই বঙ্গবিভাগ ও পাঞ্জাব বিভাগ মানতে রাজি ছিলেন না) বরং এ নিয়ে মাউন্টব্যাটনের সাথে জিন্নাহর তীব্র ঝগড়া হয়েছিল। এখন যে কেউ মিঃ জিন্নাহর ভূমিকাকে বিতর্কিত করতে পারেন এ প্রশ্ন তুলে যে, বাংলা ও পাঞ্জাবকে আস্ত রেখে ভারত বিভাগকি সম্ভব ছিল ? – দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে? আমার মতে, সম্ভব ছিল। গোটা বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করলে এবং বিনিময়ে গোটা পাঞ্জাবই হিন্দুস্তানের অন্তুর্ভূক্ত করলে বাংলা ও পাঞ্জাব এর জাতীয়তা অখন্ড থাকতো।

চার্চিল বলেছিলেন ভারতবর্ষ একটি জাতি নয় – শুধুমাত্র একটা কাল্পনিক জাতি–কাঠামো বা অবাস্তব জটিলতা। জন কেনেথ গলব্রেইথ 'সরকারী নৈরাজ্য' বলে ভারত রাষ্ট্রের বর্ণর্না দেন। তাদের মন্তব্যের বিপরীতে ভারত রাষ্ট্রের বাকি অখন্ডতা যে আশ্চর্যজনকভাবে টিকে আছে তা শুধু দুই ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের পারস্পরিক ভীতির কারণে। পাকিস্তানও একই কারণে কোন সমজাতিক রাষ্ট্র না হয়েও টিকে আছে (খন্ডিতভাবে হলেও)। পাকিস্তানের শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নেতারা তাদের সহজ সরল জনগণকে বুঝিয়েছিল এবং এখনও বুঝাচ্ছে যে হিন্দুস্তান বা ভারত তাদের পয়লা নম্বার দুশমন এবং ভারতের ক্রমবর্ধমান বিরাট সামরিক শক্তি যে কোন সময় পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন করবে। এই ভয়ে বিভিন্ন জাতিগুলো, মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও, এক হয়ে আছে। এই ঐক্য কৃত্রিম ও সাময়িক।

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলো কোন রকমে নাকমুখ বুজে কেন্দ্রের অত্যাচার ও বঞ্চনা সয়ে চলেছে ঐ একই ভীতির কারণে – যা চীন এবং পাকিস্তান তাদের প্রতি দেখিয়ে যাচ্ছে। দিল্লী তার ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের দরিদ্র সাধারণ মানুষকে বুঝাচ্ছে– বিচ্ছিন্নতার কোন আন্দোলন বা জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থান ভারত এর অস্তিত্বকেই হুমকির সম্মুখীন করবে। পশ্চিমবাংলা, আসামকেও বুঝানো হচ্ছে, স্বায়ত্তশাসন বা মুক্তির আন্দোলন করলে পরোক্ষভাবে চীন ও পাকিস্তানকে সাহায্য করা হবে। এই ধরনের কৃত্রিম আশংকা ও ভীতির সঞ্চার করে বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার বিকাশকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে ভারতে এবং পাকিস্তানে। কাশ্মীরের ব্যাপারে এখন ভারত–পাকিস্তান উভয়েই শংকিত। কাশ্মীরীরা ভারত–পাকিস্তান উভয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকেই মুক্ত হতে চায়। তারা সম্পুর্ণ স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্র হতে

চায় – যা তারা অতীতে ছিল।

আমরা বাঙালীরা স্বভাবগতভাবেই ঘরের শক্তিকে অবমূল্যায়ন করি অথচ পরের শক্তিকে অধিমূল্যায়ন করে থাকি সবসময়। আমরা নিজেদেরকে ছোট করে পরকে বড় করি। আমরা দেশের মাটি থেকে উঠে আসা নিকট নেতৃত্বতে পছন্দ করি না কিন্তু দূরের নেতৃত্ব, দূরের ব্যক্তিত্ব ইত্যাদিকে সহজেই বরণ করি (সেটা অবাঙালী হলেও) এবং গড্ডালিকা প্রবাহের মত ভেসে যাই তাদের অঙুলি হেলনে। দেশপ্রেমিক বাঙালী নেতাদের আবেদন নিবেদনে আমরা সাড়া দেই না – কিন্তু বহিরাগত নেতাদের সামান্য হাতছানিতেও আমরা দিশাহারা হয়ে যাই – আমি অবশ্য ১৯৫২ সনের আগের অবস্থার কথা বলছি। ১৯৩৫ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত সময়টাকে বাংলার ইতিহাসের 'অন্ধকার অধ্যায়' বলা যায়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭২ পর্যন্ত 'আলোর অধ্যায'। স্বদেশীদের ভাল কথায় আমরা হাসি আর বিদেশীদের ফালতু কথায়ও আমরা নাচি। এটা হলো বাঙালীর চিরন্তন আত্মবৈরী স্বভাব। জাতি হিসাবে আমরা যে আত্মঘাতী, ইতিহাসে একাধিকবার তার প্রমাণ আমরা দিয়েছি। এমন স্ববিরোধিতাপূর্ণ আচরণ পৃথিবীর আর কোন জাতি করে না। এই ধরনের দোষক্রুটি যা আমাদের রক্ত–মাংসও মজ্জায় ঢুকে গেছে তা সংশোধন করতে হলে যে সঠিক ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের দরকার তার অভাব আজ চারদিকে মহাশূণ্যতার সৃষ্টি করেছে। বাঙালীকে অবশ্যই তার অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে – হিন্দু–মুসলিম নির্বিশেষে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন বাংলার নিকট অতীতে তথা বৃটিশ–বাংলা ও পাকবাংলার আমলে সংঘটিত হয় – যেগুলো নিঃসন্দেহে আমাদের ইতিহাস এর উজ্জ্বলতম অধ্যায় যেমন, (১) বৃটিশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন (২) ১৯০৫ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত দুই বাংলা এক করার সফল আন্দোলন (৩) ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলন এবং (৪) ১৯৭১ সনের স্বাধীনতার আন্দোলন ও সংগ্রাম – যা এ জাতির ইতিহাসের মহত্তম ঘটনা। সুদূর অতীতে বাংলার শাসকরা শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া শ্যামদেশ, চম্পকরাজ্য (কম্বোডিয়া) ইত্যাদি জয় করতে পেরেছিলেন। বিশেষ করে শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ডে বাঙালীরাই সর্বপ্রথম আর্য ব্রাহ্মণমুক্ত একটি জনবসতি স্থাপন করেছিল। পূর্বভারতবর্ষের আর্য ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আদিবাসী অনার্য ও অব্রাহ্মণ বাঙালীরা বার্মা অতিক্রম করে আজকের থাইল্যান্ডে গিয়ে বসতি স্থাপন করে এবং নাম দেয় "মুক্তদেশ" অর্থাৎ 'থাইল্যান্ড'। স্থানীয় ভাষায় থাই অর্থ "মুক্ত" আর "ল্যান্ড" হলো ইংরেজী শব্দ যার অর্থ "দেশ"। আর্য ব্রাহ্মণদের হাত থেকে মুক্ত বলে বাঙালীরা ঐ দেশের নাম দেয় থ্যাইল্যান্ড – যার বাংলা নাম করণ হয় "শ্যামদেশ"। কাজেই বাংলাদেশ এর ইতিহাসের সাথে ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, চম্পকদেশ ইত্যাদির ইতিহাসও জড়িয়ে আছে। এসব বীরত্বপূর্ণ গাঁথা স্মরণাতীত কালের ব্যাপার। তবুও অতীত স্মৃতি রোমান্থনে কিছুটা হলেও উদ্দীপ্ত হই। সুদূর অতীতে আর্য ব্রাহ্মনদের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে অনার্য অব্রাহ্মণ বাঙালীরা দেশত্যাগ করে বর্তমান শ্যামদেশে গিয়ে বন কেটে বসত গড়ে তুলে এবং ঐ দেশের যে নামকরণ করে তাতে বুঝা যায় ওটা তখন আর্য ব্রাহ্মণদের অত্যাচার থেকে মুক্ত একটি দেশরূপে গণ্য হয়। কাজেই থাইল্যান্ড, শ্রীলংকার লোকেরা তাদের জাতীয়

হলেন। কি বিচিত্র নিয়তির পরিহাস!

১৯৫২ সনে অর্থাৎ বঙ্গবিভাগ এর ৫ বছর পর পাকিস্তানীরা যখন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা রূপে বাঙ্গালীদের উপর চাপাতে চায় তখন বাঙালীরা বুঝতে শুরু করলো ১৯৪৭ এর দেশভাগের মূহূর্তে পাকিস্তানীদের সাথে একত্রে বসবাস এর সিদ্ধান্ত কত বড় ভুল ছিল! ! এ ভুল বুঝতে পূর্ববাংলার মানুষের সময় লেগেছে মাত্র ৫ বছর কিন্তু পশ্চিমা বাংলার মানুষের লেগেছে ৫০ বছর মাত্র কিছুদিন হলো কলকাতার দেয়ালে 'হিন্দি হটাও. বাংলা বাঁচাও' শ্লোগান দেখা যাচ্ছে।

ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে ছাড়া পেয়ে দুইটি নতুন উপনিবেশ এর ফাঁদে পড়েছিল বাঙালীরা ১৯৪৭ এ – পাকিস্তানী এবং হিন্দুস্তানী উপনিবেশ – আবাঙালীদের উপনিবেশ। পূর্ব বাংলার মানুষের মত পশ্চিমবাংলার বাঙালীরাও একই নিয়তির স্রোতে গা ভাসিয়েছিল। বাংলার মানুষ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে দুই ভিনদেশী জাতীয়তাবাদ এর কাছে – বাংলার চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট দুই কালচার এর কাছে। উর্দু ও হিন্দির কালচার। যে দুই ভাষায় জনসংখ্যা একত্র করলেও বাংলার সমান হয় না। ১৯৪৭ এর পর থেকে ক্রমান্বয়ে দুই অভিশাপ দুই বাংলাকে গ্রাস করতে শুরু করে, অভিন্ন কায়দায়; একটি হলো পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ এর অভিশাপ, আরেকটি হলো হিন্দুস্তানী জাতীয়তাবাদের অভিশাপ। এই বাংলার শাপমোচন হয়েছে। ঐ বাংলার হয়নি। কোন অবস্থাতেই আমরা পশ্চিম বাংলাদেশকে দিল্লীর দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ অবস্থায় থাকতে দিতে পারি না। আমাদেরই হাজার বছরের মাতৃভূমির পশ্চিম অংশ শাসন করবে অবাঙালী দিল্লীওয়ালারা– এ অবস্থা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। এক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলার কিছু হিন্দুবাঙালীর মোহভঙ্গ হওয়া দরকার। তাদের হিসাবে ১৯৪৭ এ প্রচন্ড ভুল ছিল – যেমন ছিল আমাদের হিসারেও। ধর্মীয় সম্মোহন আমাদেয় দৃষ্টিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে হিসাবের খাতাটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল আমাদের চোখের সামনে। মুসলমান বাঙালীর সাথে থাকলে তাকে না হয় ক্ষমতার ৫০% ভাগ কিংবা খুব বেশি হলে ৬০% ভাগ শেয়ার দিতে হতো। কিন্তু আজ অবাঙালী হিন্দুর সাথে থাকতে গিয়ে পশ্চিম বাংলার মানুষের ক্ষমতাও প্রতিপত্তির ৯০% ভাগ শেয়ার দিতে হচ্ছে হিন্দুস্তানীদেরকে। কারণ জনসংখ্যায় তারা অবাঙালী ভারতের নয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। দিল্লী ভিত্তিক অবাঙালী হিন্দুর তুলনায় একেবারেই নগন্য হওয়ার চেয়ে কি ভাল ছিল না ঢাকা ভিত্তিক (বা কলকাতা ভিত্তিক) বাঙালী মুসলমানের তুলনায় প্রায় অর্ধেক হওয়া (৪৭% ভাগ) ? মার্কসবাদী কম্যুনিজমের চর্চা করে সে আজ পৃথক সত্ত্বা খুঁজে বেড়াচ্ছে – মূল ভারতীয় রাজনৈতিক স্রোতোধারা থেকে আলাদা হয়ে। পশ্চিমবাংলা আর ত্রিপুরার মানুষ আজ কম্যুনিস্ট পরিচয়ে বেশি গর্ববোধ করে, বাঙালী–পরিচয়ের তুলনায়। কিন্তু বাঙালী জাতিয়তাবাদ এর প্রেরণা ও উত্থান তাদের এ অন্ধকার দূর করতে পারে। জ্যেতি বসু যদি সত্যিই জ্যোতিবান হতে চান তাহলে তাকে মার্কসবাদ এর অন্ধকার গুহা থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে – পশ্চিম বাংলার দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে আলোর ঠিকানা দিতে হবে – দিতে হবে

বিশুদ্ধ বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র আর মুক্ত অর্থনীতির ঠিকানা – যা দ্রুতবেগে জাগিয়ে দেবে মেধাবী পশ্চিমবাংলাকে। যে সোনার কাঠি পশ্চিমবাংলাকে ঘুম থেকে জাগাবে তাহলো বিশুদ্ধ বাঙালী জাতীয়তাবাদ তথা 'বঙ্গবাদ'। পশ্চিমবাংলার বন্দী বাঙালীরা একা একা বিশাল ভারতের মোকাবিলা করতে পারবে না, একথা ঠিক, তবে মূল বাংলাদেশ ভূখন্ডের বাঙালীরা সত্যিকার প্রেরণা ও নেতৃত্ব দিলে এটা মোটেই অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়। হাজার হাজার বছর আগে মহাত্মা সক্রেটিসের মতবাদ বা ধ্যানধারণাকে গ্রীসের রাজারা পাগলের প্রলাপ বলে অভিহিত করেছিলেন এবং তাকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যা সত্য অর্থাৎ সক্রেটিসের ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে – সারা গ্রীস ছিল ভুল মতবাদ দ্বারা পরিচালিত। যেমন আজকের পশ্চিমবাংলা ভুল মতবাদ দ্বারা পরিচালিত। আইনসঙ্গতভাবে পশ্চিম বাংলাদেশ মূলবাংলাদেশ ভূখন্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সত্য যতো ভয়ংকরই হোক না কেন তাকে আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে স্বমহিমায়। জাতির বৃহত্তম স্বার্থে এবং "বঙ্গবাদ" এর পূর্ণতম প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের সাথে এক দীর্ঘস্থায়ী সম্ভাব্য সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে গোটা বাঙালী জাতিকে। মাথা এবং পদযুগল ছাড়া – মানবদেহকে পূর্ণাঙ্গ বলা যায় না, তেমনি পশ্চিম বঙ্গ ও আসাম ছাড়া বঙ্গদেহকে পূর্ণাঙ্গ বলা যায় না। বাঙালীর ইতিহাসে মহাসংকটের বছর হলো তিনটি – ১৯০৫, ১৯৪৭ এবং ১৯৭১। প্রথম দুই বছরে মাতৃবাংলা দ্বিখন্ডিত হয়, তৃতীয় বছরটিতে সফল মুক্তি সংগ্রামের পর বাংলার বৃহত্তম অংশ স্বাধীন হলেও পশ্চিমবাংলা অমুক্ত অবস্থায় ভারতের অধীনে থেকে যায়। ১৯১১ সনে অবশ্য বিভক্ত বঙ্গ পুনরায় একত্রিত হয়েছিল। চতুর্থ মহাসংকট আমাদের সামনে রয়েছে – যখন গোটা বাংলা আবার একত্রিত হওয়ার সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়বে একুশ শতকের প্রথম দশকে। একথা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি একুশ শতকের প্রথম যুগই হবে বাংলার সবচেয়ে সোনালী যুগ, ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। বাঙালীর দুই হাজার বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসে আগামী পনের বছর হবে সবচেয়ে বেশি বর্ণাঢ্য ও ঘটনাবহুল। বাঙালীর মহাসংকটের অর্ধেক মোচন হয় ১৯৭১ সনে বাকী অর্ধেক মোচন হবে ২১ শতকের প্রথম দশকে জাতির মহাজাগড়ন ও মহাউত্থানের মধ্যদিয়ে এমন এক নেতৃত্বের দ্বারা যে নেতৃত্ব দেশবন্ধু, শেরেবাংলা, নেতাজী, ভাসানী, শরৎ বসু এবং সর্বোপরি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবে। সুভাষ বসুও অখন্ড বাংলা চাইতেন কিন্তু একইসাথে অখন্ড ভারতও চাইতেন – যা ছিল পরস্পর বিরোধী। দেশবন্ধু সি, আর দাশও যুক্তবাংলা চাইতেন কিন্তু তা ভারতবর্ষের অর্ন্তগত হবে না স্বাধীন হবে, সে সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। শরৎ বসু অবশ্য স্বাধীন যুক্তবাংলা চাইতেন। শ্রদ্ধেয় আবুল হাশিমও চাইতেন তবে তারা দুজনেই সমাজতন্ত্রের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। অন্যপক্ষে হিন্দু মহাসভার নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মূখার্জী রীতিমত আন্দোলন করছিলেন বঙ্গভঙ্গের পক্ষে যাতে করে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অর্ন্তগত হয়। বঙ্গীয় নেতারা সর্বভারতীয় নেতৃত্বের কাছে প্রায় সকলেই আত্মসমর্পণ করেছিলেন একমাত্র দেশবন্ধু ছাড়া। দেশবন্ধু এবং নেতাজীর অকালমৃত্যু এক্ষেত্রে অপুরনীয় শূণ্যতার সৃষ্টি করে। বাংলা কংগ্রেসের 'বিগ ফাইভ' বা বিশাল পাঁচ ব্যক্তিত্ব – যেমন শরৎ বসু, কিরণশংকর রায়, তুলশী গোস্বামী, কুমার দেবেন্দ্র লাল খাঁ, সৌরিন্দ্র্যমোহন চক্রবর্তী, শরৎ বসু – এদের ভূমিকা অখন্ড বাংলার পক্ষে সহায়ক

বোধগম্য নয় ? কলিকাতা ও নোয়াখালী অঞ্চলের মুসলমানরা যদি বাঙালী হিন্দুদের বৈরী হয়ে থাকে তবে তা হয়েছিল মাত্র কয়েকটি বিশেষ সময়ের জন্য – সর্বকালের জন্য নয়। কিন্তু আজ সারা হিন্দুস্তান এর গুজরাটী, মাড়োয়ারী, বোম্বাইওয়ালা, দিল্লীওয়ালা ইত্যাদি সকল মেড়োরা পশ্চিমবাংলার অধিবাসীদের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন। মিলিত বাংলায় মুসলমানরা ৫৩% ভাগ আর হিন্দুরা ৪৭% ভাগ ছিল কিন্তু মিলিত ভারতে আজ বাঙালীরা ১০% ভাগ মাত্র আর অবাঙ্গালীরা ৯০% ভাগ। প্রতি ১০০ জন ভারতীয়দের মধ্যে অবাঙ্গালীরা বাঙালীদের চেয়ে ৮০ জনই বেশি। কিন্তু যুক্তবাংলায় একশত জন বাঙালীর মধ্যে বাঙালী মুসলমানরা সংখ্যায় মাত্র (৫৩–৪৭) = ৬ জন বেশি হতো। এই হিসাবের ভুলই পশ্চিমবাংলার দুর্ভাগ্যের একমাত্র কারণ।

আজ হিন্দুস্তানী কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠী যেভাবে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার উপর প্রচন্ড প্রাধান্য বিস্তার করে চলছে, গোটা বাংলার মুসলমানরা একত্রিত হয়ে তার দশভাগের একভাগ প্রাধান্যও বিস্তার করতে পারতো না হিন্দুদের উপর – যদি দুই বাংলা এক থাকতো। কারণ তখনকার বসু–সোহরাওয়ার্দী পরিকল্পনা মোতাবেক সবকিছুতে হিন্দু–মুসলমান বাঙালীর ৫০:৫০ প্রতিনিধিত্ব থাকতো। দাঙ্গাটা হলো প্রধানতঃ "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" এর কারণে আর "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" শুরু হলো ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান নিয়ে লীগ আর কংগ্রেস এর মধ্যে তীব্র মতবিরোধ এর কারণে। কিন্তু বাংলার কোন নেতার হাতে লীগ বা কংগ্রেস এর শীর্ষ নেতৃত্ব ছিল না। কাজেই দেখা যায়, অবাঙালী নেতাদের নির্দেশ অনুসারে বাংলার সরলপ্রাণ মানুষেরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয় – যা পরে রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয়। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' আন্দোলন বাংলার যে ক্ষতি করেছে তা বাংলার দুই হাজার বছরের ইতিহাসে অতীতে আর কোন ঘটনা করতে পারেনি। গত অর্ধ শতাব্দীতে আমরা বাংলাদেশের মানুষেরা কি পেয়েছি তার একটা সঠিক মূল্যায়ন হওয়া দরকার। আমরা প্রথমে ১৯৪৭ এ পেয়েছিলাম অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তান, ১৯৭১ এর পরে পেয়েছি অর্ধেক বাংলা, অর্ধেক জমি, অর্ধেক জন, অর্ধেক জল বা পানি এবং অর্ধেক জাতি। আমরা যেন অর্ধেক অস্তিত্বের নিয়তি নিয়ে জন্মেছিলাম ভারতবর্ষ নামক মহাদেশটির পূর্বকোণে – যা এক যাদুর মহাদেশ (continent of Circe) যা পশ্চিম বাংলা ও আসামকে কেড়ে নিল আমাদের কাছ থেকে। অনুকূল বাতাস পেলে ছোট্ট একটা আগুনের হল্‌কা একটা গোটা বস্তি জ্বালিয়ে দিতে পারে। দাঙ্গাও তেমনি। ছোট্ট আকার থেকে বেড়ে গিয়ে অতি দ্রুতগতিতে সে ব্যাপক এলাকাকে গ্রাস করতে পারে। কিন্তু তা বলে সাময়িক দাঙ্গাকে একটা গোটা সম্প্রদায়ের চিরকালীন আচরণ বলে ভুল করলে সমগ্র জাতি যুক্তিনির্ভর না হয়ে আবেগ–নির্ভর হয়ে পড়ে। গোটা পশ্চিম বাংলার এম. এল. এরা এই আবেগ নির্ভরতার বশে বঙ্গবিভাগের পক্ষেও ভারত ইউনিয়নে যোগ দেয়ার পক্ষে ভোট দেয় যদিও সমগ্র বাংলায় তারা ছিল সংখ্যালঘু। সংখ্যাগুরু এম, এল, এরা অবশ্য বাংলাবিভাগ এর বিপক্ষে ভোট দেয়। এতে প্রমাণিত হয় যে বাংলা বিভক্ত হয় সংখ্যালঘু এম. এল. এ. দের ভোটে যা ছিল সম্পূর্ণ বেআইনী। আর ঐ বেআইনী ভোটের উপর ভিত্তি করে ব্রিটিশরা সংখ্যাগুরু এম. এল. এ.

দের মতামতকে আগ্রাহ্য করে বাংলাকে ভাগ করে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাবিভাগ আজও আইনসিদ্ধ নয়। – কেননা মেজরিটি এম. এল. এ রা ভোট দিয়েছিল অবিভক্ত বাংলার পক্ষে। পশ্চিমবাংলার হিন্দুদের প্রতিনিধি এম. এল. এ. রা সংখ্যায় কম হয়েও বঙ্গবিভাগের পক্ষে ভোট দেয় এবং ইংরেজরা অন্যায়ভাবে মাইনরিটির সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত করেছিল।

একইভাবে আবেগতাড়িত হয়ে পূর্ববাংলার মানুষেরাও পাকিস্তান নামক ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ভেতর অন্তর্ভূক্ত হতে আগ্রহী হলো। অবাঙালীদের প্রভূত্ব ও প্রাধান্য মেনে নিয়ে দুটি ভিনদেশী কেন্দ্রীয় সরকারের লেজুড় বৃত্তি করতে রাজী হলো দুই বাংলার মানুষেরা অথচ তখন এই বাঙ্গালীরা সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বাঙ্গলা গঠন করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ভারতবর্ষ ১৫ টি বড় ভাষার ১৫ টি ভিন্ন ভিন্ন জাতির এ অদ্ভুত মিশ্রিত রূপ ! এই মহাদেশের অনেক ক্ষুদে জাতির সাথে বাঙালী নামক মহাজাতির তুলনা করলে তা হবে হাস্যকর। কেননা, চীনা জাতিকে বাদ দিলে একক ভাষার বন্ধনে আবদ্ধ এত বড় জাতি সারাবিশ্বে আর একটিও নেই। লোকসংখ্যার ভিত্তিতে সমজাতিক জনগোষ্ঠী হিসাবে ভারতবর্ষে বাঙালীরা বৃহত্তম জাতি আর সারা পৃথিবীতে তারা দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি। শুধুমাত্র চীনারা তাদের চেয়ে বড় জাতি অর্থাৎ এক নাম্বারে চীনাদের অবস্থান। এ ধরনের একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য কোটি কোটি বাঙালীর কাছে অজানা বলেই বিশ্বাস। বাঙালীরা স্বজাতি সম্পর্কে তেমন কিছু না জানলেও পরজাতি সম্পর্কে যথেষ্ট খোঁজখবর রাখে এবং তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ভারতীয়রা যদি একজাতি হতো তবে তারা আকারে আমাদের চেয়ে অনেক বড় হতো। কিন্তু ভারত প্রায় ১৫টি ভিন্ন ভিন্ন জাতি গোষ্ঠির এক পাঁচমিশালী যুক্তরাষ্ট্র। পাকিস্তানীরাও পাঁচটি জাতি গোষ্ঠির সংমিশ্রণ। জনসংখ্যার মানদন্ডে বিচার করলে ভারতের গুজরাটী, মারাঠী, কশ্মিরী, তামিল, তেলেগু, রাজস্থানী, মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী, শিখ, মাদ্রাজী ইত্যাদি জাতির তুলনায় বাঙালীরা এক মহা জাতি। সম্মিলিত বাঙালী জাতি প্রায় ২৪ কোটি হয়।

আমেরিকান, রাশিয়ান, জার্মান, ফরাসী, স্পেনিশ, ইটালিয়ান, আরবীয়, মিশরীয়, সুদানী, জাপানী; ইন্দোনেশীয়, শ্রীলংকান, কোরিয়ান, মালয়েশিয়ান ইত্যাদি সকল জাতি সংখ্যায় বাঙালীদের চেয়ে ছোট। একমাত্র চীনা জাতি আমাদের চেয়ে বড়।

১৯৩৭ সনে ভারতীয় কংগ্রেস বাংলার কংগ্রেসকে ফজলুল হকের প্রজাপার্টির সাথে সহযোগিতা করতে দিল না অথচ ঐ বছরই প্রজাপার্টি ও লীগ মিলে বাংলার মন্ত্রিসভা গঠন করলো। মূলতঃ গান্ধীর বিরোধিতার জন্যই প্রজাপার্টি আর কংগ্রেস এর কোয়ালিশন সরকার গঠন করা গেল না বাংলায়। তার দু'বছর পর ১৯৩৯ সনে সুভাষ বসু মহাত্মা গান্ধীকে ভোটে হারিয়ে পরবর্তীতে তারই বিরোধিতায় অতিষ্ঠ হয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এখানে উল্লেখ্য যে, ডঃ শ্যামা প্রসাদ মূখ্যার্জী এবং লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রেয় বাংলাকে বিভক্ত করার জন্য রীতিমত আন্দোলন করেছিলেন। স্বাধীন ভারত সৃষ্টি হবার পর শরৎচন্দ্র বসু বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত হলেন অথচ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, ডঃ বিধান চন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী

১৯৩৫ থেকে ১৯৪৭ এই বার বছর বাংলার ইতিহাস এর অন্ধকার যুগ। ১৯৩৫ সনে উড়িষ্যা ও বিহারকে অবিভক্ত বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা প্রদেশ হিসাবে গণ্য করা হয় বৃটিশরাজ কর্তৃক। তার দুই বছর পর অর্থাৎ ১৯৩৭ সনে আরকানকে আলাদা করা হয় অবিভক্ত বাংলা থেকে এবং বার্মার সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয় অত্যন্ত অন্যায়ভাবে – যখন বার্মাকে বৃটিশ ভারত থেকে আলাদা করা হয়। মুগল–ভারতে বাংলাদেশ বিশাল আকৃতি নিয়েই ছিল। বৃটিশ ভারতের শেষদিকে সেই বাংলাকে কেটে ছোট করা হয়, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে বঙ্গশক্তি যাতে খর্ব হয়ে যায়। ১৮৭৪ সনে বাংলার পূর্বদিকের অসম (অসমান ও উঁচু–নিচু) তথা পাহাড়ী অঞ্চলকে আসাম নাম দিয়ে একটি আলাদা প্রদেশ গঠন করেছিল ইংরেজরা – যাতে বাংলার আকার ছোট হয়ে যায়। সমগ্র ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত ছিল বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি। সে কারণে এই মহান দেশ ও মহান জাতিকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলা ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে ছিল একটি কার্যকর রাজনৈতিক কৌশল – যেমন ছিল ১৯০৫ সনের বঙ্গবিভাগ এবং ১৯১২ সনের রাজধানী স্থানান্তর, কলকাতা থেকে দিল্লী!

দেখা যায়, নিম্নরূপ চারটি পরিবর্তণ ঘটানো হয় বঙ্গদেহে ঃ–

(১) ১৯০৫ সনে মূল বাংলা থেকে পশ্চিম বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করা হয় প্রশাসনিক সুবিধার অজুহাতে।

(২) ১৯৩৫ সনে উড়িষ্যা এবং বিহারকে বিচ্ছিন্ন করা হয় একই কারণ দেখিয়ে।

(৩) ১৯৩৭ সনে আরাকান রাজ্যটি বিচ্ছিন্ন করে বার্মার সাথে সংযুক্ত করা হয়।

(৪) ১৯৪৭ সনে ক্ষুদ্রায়িত বঙ্গদেহের যেটুকু বাকি ছিল তারও বিলুপ্তি ঘটে সাম্প্রদায়িক বঙ্গবিভাগের মাধ্যমে। পূর্বের ভাগ পাকিস্তানের দখলে আর পশ্চিমের ভাগ হিন্দুস্তানের দখলে চলে যাবার পর মূল দেশ বাঙালীস্তান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় বৃটিশরাজ, হিন্দুস্তানরাজ আর পাকিস্তানরাজ এর তরবারির আঘাতে। বাঙালীরা তাদের নিজের দেশের দখল হারায় অবাঙালীদের কাছে।

সেই অন্ধকার যুগে (১৩৩৫–১৯৪৭) যুক্তবাংলাকে পাকিস্তান বা হিন্দুস্তানের অংশ হিসাবে না দেখে সার্বভৌম অখন্ড একটি দেশ ও জাতি হিসাবে দেখতে চেয়েছে এমন নেতার সংখ্যা ঐ সময়ে ছিল বিরল। আর এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না বললেই চলে – দেশ বন্ধুর 'স্বরাজ পার্টি' কিংবা শেরে বাংলার 'কৃষক প্রজাপার্টি বা নেতাজীর 'বাংলা পার্টি' অত্যন্ত সাময়িকভাবে বঙ্গবাদী আবেগ–উচ্ছ্বাসের জন্ম দিয়েছিল – অনেকটা ক্ষণস্থায়ী রঙিন বুদবুদের মত। সমস্ত দলগুলো ছিল নিখিল ভারত ভিত্তিক – নিখিল বঙ্গভিত্তিক দলের অভাবে বিশুদ্ধ বঙ্গবাদী রাজনীতি বিকশিত হয়নি। ইংরেজদের ভারত ত্যাগের পূর্ববর্তী যুগটিতে, যাকে আমি অন্ধকার যুগ বলছি (১৯৩৫ থেকে ৪৭), এটাই ছিল বাংলার রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় শূন্যতা।

ইংরেজ রাজত্বের আগে ভারতবর্ষ নামক মহাদেশ তুল্য উপমহাদেশটি মুসলিম

শাসনের অধীন ছিল। কাজেই ইংরেজ চলে গেলে আবার মুসলমানদের দ্বারা শাসিত হতে হবে এই অমূলক আশংকায় পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু এম, এল, রা স্বাধীন যুক্ত বঙ্গদেশ গঠনের ব্যাপারে তেমন কোন উৎসাহ দেখাননি। কিন্তু পূর্ণিয়া, পুরুলিয়া, চুরুলিয়া, চন্দননগর, ছোট নাগপুর, মানভুম, সিংভুম, কাছাড়, গোয়ালপাড়া, আসামের সুরমা উপত্যাকা ইত্যাদি বাংলাদেশ সীমানায় অন্তুভূর্ক্ত হলে হিন্দু-মুসলমান এর সংখ্যার ব্যবধান অনেক কমে যেতো। সে অবস্থায় মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক প্রাধান্য বিস্তার এর প্রশ্নই উঠতো না। তাছাড়া হিন্দু বাঙ্গালী সম্প্রদায় শিক্ষা-দিক্ষায় ও শিল্প বানিজ্যে মুসলমানদের তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিল। কাজেই হিন্দু মহাসভা তাদের মাথায় বঙ্গবিভাগের যে বুদ্ধি ঢুকিয়েছিল তা ছিল হিন্দু ধর্মীয় মৌলবাদ, আর মুসলীম লীগ ক্ষুদ্রাকার পূর্ব পাকিস্তান বানাবার জন্য যে পরিকল্পনা মেনে নিয়েছিল তাও ছিল ধর্ম নিয়ে ব্যবসাকরার মত একটি ব্যাপার। আর কংগ্রেস তাদের মাথায় যে বুদ্ধি ঢুকিয়েছিল তাহলো 'তোমরা অখন্ড বাংলাদেশ বানাতে পারো, কিন্তু স্বাধীন হতে পারবে না - তোমাদেরকে হিন্দুস্তানের অধীন হতে হবে।' এই দুইটি সংগঠনের লক্ষ্য যে ভুল ছিল ইতিহাস তা' প্রমাণ করেছে। আজকের বাংলাদেশে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব নেই। পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। অর্থাৎ বাংলার কোন অংশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি স্থায়িত্ব লাভ করেনি। ১৯৩৫ থেকে ৪৭, এই বার বছরের যুগটিই ছিল 'তমসার যুগ' - সাম্প্রদায়িক রাজনীতি তখন প্রবল হয়েছিল ইংরেজদের আর অবাঙালী নেতাদের প্ররোচনায়।

প্রচুর মেধাবী রাজনীতিবিদ, বক্তা, লেখক, শিল্পী, কবি এবং গায়ক থাকা সত্বেও নিখিল বাংলায় সঠিক নেতৃত্বের এই যে দেউলিয়াপনা তা বিরাজ করছিল ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত - যখন সঠিক বঙ্গবাদী নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। বাংলার রাজনীতি ছিল মূলতঃ অস্পষ্টতার রাজনীতি। একমাত্র শরৎবসু ও আবুল হাশিম ছাড়া কেউ স্পষ্ট ছিলেন না।

সোহরাওয়ার্দী ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকায় থেকে দলীয় নির্দেশের বাইরে কিছুই করতে পারেননি। দলীয় নির্দেশগুলো ছিল সর্বভারতীয় - সর্ববঙ্গীয় নয়। খাজা নাজিমউদ্দিন ও বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেম - কিন্তু তিনি ছিলেন মূলতঃ উর্দুভাষী - বাংলা ভাষাও সংস্কৃতির প্রতি তার খুব একটা আকর্ষণ ছিল না।

'বাংলা-আসাম' অঞ্চল চিরদিনই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বড় দেশ ও জাতি। এই বিশাল সমৃদ্ধশালী অঞ্চলের কোন প্রয়োজন ছিল না হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তানের লেজুড় হওয়ার। যে প্রেক্ষাপটে পশ্চিম বাংলা ও আসাম ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল ১৯৪৭ সনে বর্তমানে সে প্রেক্ষাপট আর নেই বরং উল্টোটাই কাজ করছে। মাত্র তিন সপ্তাহের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা (তাও মাত্র দুইটি অঞ্চলে - কলিকাতা আর নোয়াখালীতে) একটি মহাজাতি ও মহান দেশ এর দুই হাজার কছরের ঐক্য ও সংহতিকে নষ্ট করতে পারে কি করে তা আমার

উৎসের সন্ধান করলেই দেখতে পাবে তাদের পূর্ব পুরুষের বাসভূমি হচ্ছে এই বাংলাদেশ।

স্বজাতির জন্য মোটেও দরদ নেই অথচ পরজাতির জন্য মায়া উপছে পড়ছে – এ রকম দৃষ্টিভঙ্গি শুধু বাঙালী ছাড়া আর কোন জাতির মধ্যে নেই। শুধুমাত্র দেশবন্ধু, নেতাজী কিংবা শেরে বাংলার পেছনে যদি গোটা বাংলার মানুষ এক হয়ে দাঁড়াতো তবে অবশ্যই আজ বিশ্বের বুকে স্বাধীন সার্বভৌম অখন্ড বাংলাই প্রতিষ্ঠিত হতো – সারা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমভাষী জাতি হিসাবে অত্মপ্রকাশ করতো বাঙালীরা। যা হতো ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দেশ – যার পেছনের আঙিনা হতো গোটা আসাম–ত্রিপুরা অঞ্চল।

অন্যান্য মুসলিম নেতাদের মত ফজলুল হকের ব্যাপারে হিন্দু বাঙালীদের কোন অভিযোগ ছিল না। মুসলমান হিসাবে তিনি যেমন খাঁটি ছিলেন, বাঙালী হিসাবেও তিনি তেমনি খাঁটি ছিলেন। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতীক হিসাবে অভিহিত করেছিলেন। অদৃষ্টের কি পরিহাস এই ফজলুল হকই মুসলিম লীগের হয়ে লাহোর প্রস্তাব এর উত্থাপন করেণ – যে প্রস্তাব এর ভিত্তিতে পরবর্তীতে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। যদিও মাঝখানে লাহোর প্রস্তাব সংশোধিত হয়ে দিল্লী প্রস্তাব নাম গ্রহণ করে । পরবর্তীকালে তাঁর কলিকাতা সফরের সময় বিপুল জনতার সম্বর্ধনায় তিনি আবেগ আপ্লুত ও বিচলিত হয়ে পড়েন এবং অসতর্ক হয়ে বলে ফেললেন – 'আমি পাকিস্তান–হিন্দুস্তান বুঝি না, আমি বুঝি বাংলাদেশ।' আসলে এই আবেগটিই ছিল আমাদের ইতিহাস এর সবচেয়ে বড় সত্য। তাঁরই গুরু আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ও বলেছিলেন "আমি কংগ্রেসীদের ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বুঝি না, আমি বুঝি বাঙালী জাতীয়তাবাদ।" গুরু–শিষ্য দু'জনেই উপলব্ধি করেছিলেন কিন্তু এ লক্ষ্যে বাস্তব কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে কেউই সমর্থ হননি। বাঙালীর সেই চিরন্তন ব্যাধি – কল্পনার সাথে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ না করা – তাই দায়ী ছিল নেতৃত্বের শূন্যতার জন্য। কারণ সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবভিত্তিক বিশাল সংগঠন "কংগ্রেস" গড়ে তোলা হয়। পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে "মুসলিম লীগ" নামে বিশাল সংগঠন ছিল। কিন্তু পাশাপাশি "বাঙালী জাতীয়তাবদ" প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের নেতারা কোন ধর্মনিরপেক্ষ সর্ববঙ্গীয় বিশাল সংগঠন গড়ে তুলতে পারেননি কিংবা চাননি। হিন্দু–মুসলিম, বৌদ্ধ নির্বিশেষে সকল বাঙালী নেতাকেই আমি দায়ী করছি এ ক্ষেত্রে। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কি তার প্রিয় ছাত্র ফজলুল হককে জোর দিয়ে বলতে পারতেন না ? – "লীগ বা কংগ্রেস এর লেজুড়বৃত্তি না করে সমগ্র বাঙালী জাতিকে নিয়ে তুমি সম্পূর্ণ পৃথক একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল গঠন কর কিংবা কৃষক–প্রজা পার্টিকেই বাঙালীর একমাত্র দল হিসাবে টিকিয়ে রাখো ?"

পরের দেশ বানাবার জন্য অর্থাৎ পাকিস্তান আর হিন্দুস্তান বানাবার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালীরা নিজেদের ভেতর মারামারি করে মরলো – কিন্তু লাভ হলো শুধু

অবাঙালীদের। একটিমাত্র অবাঙালী প্রদেশের ক্ষতি হয়েছে আর তাহলো পাঞ্জাব প্রদেশ – যাকে দ্বিখন্ডিত করা হয়েছিল, কিন্তু বঙ্গদেশ আর পাঞ্জাব প্রদেশ এই দুটি নামের মধ্যেই উভয়ের মর্যাদা প্রকাশ পায়। একটি দেশকে দ্বিখন্ডিত করা আর একটি প্রদেশকে দ্বিখন্ডিত করা কখনও এক হতে পারে না। কাজেই বঙ্গদেশ বিভাগ আর পাঞ্জাব প্রদেশ বিভাগ কিছুতেই সমার্থক নয়।

বর্তমানে ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম বাংলাদেশ আর আসাম অঞ্চল বর্তমান ভারতীয় পরাকেন্দ্রীক শাসনের হাতে সবচেয়ে বেশী অবহেলিত, বঞ্চিত ও শোষিত। ১৯৭১ সনে বাঙালী জাতির পূর্বাংশ স্বাধীন হলেও পশ্চিমাংশ এখনও ভারতের অধীন। আসলে পশ্চিম বাংলাদেশ মূল বাংলাদেশেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ – এই ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সত্যটি জাতিসংঘকে উপলব্ধি করতে হবে। প্রাচীন অখন্ড সোনার বাংলা আমাদের হারানো স্বর্গ – যা আমরা ফিরে পেতে চাই। গ্রেট বৃটেন এর মতো গ্রেট বাংলা চাই। গ্রেট বৃটেনের উপনিবেশবাদী শাসকেরাই আমাদের গ্রেটনেসকে হরণ করে এক স্বলবাংলা উপহার দিয়েছে আমাদেরকে।

কলংকিত ১৯৪৭ সনে বঙ্গমাতা তার দেহের এক অংশকে হারিয়েছে ভারতে আরেক অংশকে হারিয়েছে পাকিস্তানে। ১৯৭১ সনে পূর্ব অংশটিকে ফিরে পেয়েছে। একুশ শতকের প্রথম যুগেই বাকি অংশটিও ফিরে পাবে ভারতের বন্দীদশা থেকে। কারণ সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, নির্ভেজাল বাঙালী জাতীয়তা, সংস্কৃতি ও বঙ্গভাষাকে রক্ষা করার একমাত্র দুর্গ হচ্ছ আজকের 'স্বাধীন বাংলাদেশ'। দুই জার্মানীর মধ্যেকার 'বার্লিন ওয়াল' যেমন ভেঙে গেছে তেমনি দুই বাংলার মধ্যে, অদৃশ্যভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে 'বেঙ্গলী ওয়াল'–তাও তেমনি ভেঙে যাবে – সেদিন বেশী দূরে নয়। দুই শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে দুই বাংলাও পরস্পরকে আলিঙ্গন করবে গভীর দেশপ্রেম ও শাশ্বত বাঙালী জাতীয়তাবাদের উষ্ণ চেতনায় – এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ একুশ শতকের প্রথম যুগই হচ্ছেবাঙালীর মহাউত্থানের যুগ। শুধু মহাবঙ্গবাদ এর পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে পারলেই হলো। একটা বিশুদ্ধ বৈশিষ্ট্যময় মহাজাতি যখন অন্য (১৫টি মিশ্রিত জাতির) একটি রাষ্ট্রের ভগ্নাংশ হয়ে যায়, তখন তার অধঃপতন হয় সবচেয়ে বেশি। সেই অধঃপতনের অন্ধকার আজ পশিচম বাংলার মানুষেরা দূর করতে পারছে না। জ্যোতিবসুর জ্যোতি এক্ষেত্রে আলো ছড়াতে পারছে না – কারণ তার দলের নাম 'ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি' – 'বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদী পার্টি' নয়। পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন বাংলার অনুকূলে সমগ্র বঙ্গভূবনে জনমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থই হচ্ছে "বঙ্গবাদ" এর প্রতিষ্ঠা যার অর্থই হচ্ছে – অমুক্ত বঙ্গের মুক্তি ও মূল বাংলাদেশের সাথে কনফেডারেশন ভুক্তি। পূর্ণাঙ্গ জাতিতত্ত্ব "বঙ্গবাদ" এর মলয় বাতাস আজ বইতে শুরু করেছে উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণের বঙ্গ–উপসাগর পর্যন্ত আর পশ্চিমের দ্বারভাঙ্গা থেকে আসাম এর শেষ পূর্ব সীমানা পর্যন্ত। নতুন শতাব্দীতে নতুন করে পুনর্জন্ম লাভ করবে গরিয়সী, মহিয়সী বাংলা অর্থাৎ আমাদের সকলের স্বপ্ন মাতৃবাংলা।

আমার কাছে – মনে হয়েছে নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর কাছেও, যিনি শরৎ বসুর অনুরাগী ও যুক্ত বাংলার একজন শক্তিশালী প্রবক্তা ছিলেন।

সঙ্গীতে মিল আছে, কবিতায় মিল আছে, মেঘে আর বিজলীতে মিল আছে, মিল আছে বঙ্গোপসাগরের ঢেউ এর সাথে সাগর পাড়ের কাশবনের ঢেউ এর, মিতালী আছে মেঘে আর মাধবী ফুলে, মিল আছে পুষ্পের সাথে মালিকার – মিল নেই কেবল বাঙালীর সাথে বাঙালীর। দেশ ভাঙ্গার জন্য বাঙালী প্রাণ দিয়েছে – দেশ গড়ার জন্য নয়। অনৈক্যের জন্য নিজের সাথে লড়েছে, ঐক্যের জন্য পরের সাথে ও লড়েনি। জার্মানদের প্রতি তাদের দেশ নিয়ে গর্ব করার জন্য তাগিদ দিয়েছেন হেলমুট কোহ্ল। তিনি জার্মান জাতীয়তাবাদের কিছু কিছু উপাদানেরও পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন।

পিতৃভূমির অখন্ডতা ও স্থলগত সীমানা রক্ষা করা সকল বাঙালী নাগরিকের দায়িত্ব, পশ্চিম বাংলাদেশের লোকেরা যদি একাজে ব্যর্থ হয় কিংবা বিশালাকার শত্রুর সামনে অসহায় বোধ করে তাহলে পূর্ব বাংলাদেশের তথা বর্তমান বাংলাদেশের বীর সহজাতিয়তাবাদী ও সহনাগরিকরা অবশ্যই তাদেরকে সাহয্য করবে ভারতীয়দেরকে বাংলার পূর্ণ্যভূমি থেকে বহিষ্কার করার কাজে। বাঙালী নামক মহাজাতির মহান ঐক্যবদ্ধ দেশটির পশ্চিম সীমান্ত বেনাপোল নয় দ্বারভাঙ্গা অর্থাৎ বা দ্বারবঙ্গে – ঐতিহাসিকভাবে ঐ জায়গার নামের অর্থই হলো বঙ্গের দ্বার বা বঙ্গের প্রবেশ পথ।

"বঙ্গবাদ" হচ্ছে বিশ্বের সকল বাঙালীর রাখিবন্ধন। ত্রিপুরা–আসাম–আরাকান পশ্চিমবাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সকল বাঙালীকেই বঙ্গবাদী হতে হবে অর্থাৎ বঙ্গবাদের মর্যাদা উপলব্ধি করতে হবে। মহাবঙ্গবাদ বা সর্ববঙ্গবাদ যার অর্থ প্যান –বেঙ্গলিজম, তার নেশা যে কি গভীর তা ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে মহাজাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণে ১৯০৫ সনেই বুঝে ছিল বাঙালীরা, বিদেশীদের আঘাতে আমাদের পিতৃভূমি যখন দুটুকরা হয়েছিল। আরেকটি জাতি তা বুঝেছিল প্যান জার্মানিজমের মাধ্যমে জার্মান জাতি মাত্র ৪ বছরে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তি ও সভ্যতায় পরিণত হয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের উন্মাদনায় না জড়ালে তারাই হতো পৃথিবীর সেরা জাতি ও সভ্যতা। অন্ধ জাতীয়তাবাদ সমর্থনযোগ্য নয় কিন্তু পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে পশ্চিমবাংলাকে মুক্ত করতে হলে প্রয়োজনবোধে অন্ধ এবং উগ্রতম জাতীয়তাবাদের উত্থান প্রয়োজন এবং তা অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। সাংস্কৃতিক বিজয় যেমন সবচেয়ে বড় বিজয় সাংস্কৃতিক পরাজয় তেমনি সবচেয়ে বড় পরাজয় – পশ্চিম বাংলার মানুষ আজ অত্যন্ত অসহায়ভাবে সাংস্কৃতিক পরাজয়ের সম্মূখীন। হিন্দি কালচারের দানব তার সামনে দাঁড়িয়ে হুমকি দিচ্ছে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিকে গিলে ফেলার জন্য এই হিন্দি দানবের মৃত্যুদূত হচ্ছে বঙ্গবাদ। আর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর মুক্তিদূতও হলো বঙ্গবাদ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জায়গা দখল করেছে হিন্দুস্তানী মাড়োয়ারী গুজরাটি, পাঞ্জাবী চক্র ও দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসকমন্ডলী। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এ দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। তাদের উত্তরসূরীরা

(অর্থাৎ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী) ও বাধ্য হবে গোটা বাংলার পূণ্যভূমি ছেড়ে যেতে। আমি আবারও বলছি বাঙালীরা পারবে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের বাস্তবায়ন করতে অর্থাৎ বাংলা-আসাম অঞ্চলকে এক দেশ এক জাতিতে পরিণত করতে। এই মহাজাতি কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত মিত্ররাষ্ট্রের জোট হিসেবে টিকে থাকবে কনফেডারেশনের আকারে এবং সুদূর অতীতের মত আবারও বিশ্বের সমৃদ্ধতম অঞ্চল হিসাবে গড়ে উঠবে মহীয়সী গড়িয়সী বাংলা।

অন্তরের পরিবর্তনই আসল পরিবর্তন – আত্মার পরিবর্তনই আসল পরিবর্তন – এ যদি সত্য হয় তবে পশ্চিমবাংলার মানুষের অন্তরের পরিবর্তন ঘটাতে যে নেতৃত্বের প্রয়োজন তা তৈরী হতে সময় লাগবে না – তার প্রেরণার উৎস হবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের সূতিকাগার বর্তমান বাংলাদেশ। পূর্ব জার্মানী যখন পশ্চিম জার্মানীর সাথে পুনর্মিলিত হওয়ার আকাঙ্খা ব্যক্ত করে তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন বাঁধা দেয়নি কারণ তারা জানতো বাঁধা দিয়ে লাভ হবে না। কারণ সমস্ত জার্মান জাতির আত্মা পুনর্মিলন চেয়েছিল। অন্তরের দাবীই সবচেয়ে বড় দাবী। একইভাবে সমগ্র বাঙালী জাতির অন্তর ও আত্মা যদি পুনর্মিলনের ইচ্ছা ব্যক্ত করে – তাহলে ভারত কেন সমগ্র বিশ্ব এক হয়ে এলেও তাদের রুখতে পারবে না। এটাই ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য গতি – যে গতি দুই ভিয়েতনামকে এক করেছে – দুই কোরিয়াকেও এক করতে যাচ্ছে। বৃটিশ ভারতে যুক্ত বাংলা দিল্লীর অধীনে থাকলেও মোগল ভারতে যুক্ত বাংলা বেশিরভাগ সময় দিল্লীর অধীনতা থেকে মুক্ত, স্বাধীন ছিল। এ বিষয়টি স্বতন্ত্র জাতির মর্যাদা দিয়েছিল বাঙালী জাতিকে।

এখন বাঙালীরা "একজাতি – একদেশ" না হয়ে " একজাতি দুইদেশ" হয়ে আছে – যা অপ্রাকৃতিক ও অস্বাভাবিক। নিয়তি বাংলার ললাটে এঁকে দিবে মুক্তির জয়টীকা। যে নিয়তি ১৯৯০ সনে দুই জার্মানীকে একত্রিত করেছে। দুই জার্মানীর মধ্যে প্রাচীর ছিল। দুই বাংলার মধ্যে প্রাচীর না থাকলেও ধর্মবিদ্বেষের এক অদৃশ্য প্রাচীর আজও বাধা হয়ে আছ – যা নতুন নেতৃত্বকে অবশ্যই আপসারণ করতে হবে। এটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। দাঙ্গার জনক ছিল অদূরদর্শী ও অযোগ্য নেতারা আর দাঙ্গার ঘটক ছিল উভয় সম্প্রদায়ের গুন্ডারা। সাধারণ মানুষের চিরকালীন সামগ্রিক আচরণ সাম্প্রদায়িক ছিল না কোনদিনই। অথচ এই অতি অল্পসময়ের উত্তেজনা, যা রাজনৈতিক প্রভুদের সৃষ্ট, তা সাধারণ বাঙালীর ভাগ্যকে চিরদিনের জন্য বিড়ম্বিত করে দিয়েছিল।

মোগল আমলে বিভিন্ন সময়ে বাংলা দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং স্বাধীন মর্যাদা বজায় রাখে। সিরাজ-উদ-দৌলা ছিলেন স্বাধীন বাংলার শেষ শাসক। ইংরেজ আমলে আবার দিল্লী রাজধানী হয় ১৯১২ সনে। ইংরেজ চলে যাবার পর শুধু দিল্লী এবং – করাচীও রাজধানী হয় পূর্ববঙ্গের লোকদের জন্য। ইংরেজ চলে যাবার পর দিল্লী নয় – করাচীর শাসন থেকে মুক্ত হতে পারা উচিত ছিল আমাদের কারণ বাংলা যে ভারত থেকে আলাদা একটি

মধ্যে দৈহিক বা মানসিক কোন দূরত্ব নেই। কিন্তু হিন্দুস্তান ও পশ্চিমবাংলার মধ্যে (দৈহিক দুরত্ব না থাকলেও) মানসিক ও আত্মিক দূরত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ বঙ্গবলয় ও হিন্দিবলয় স্পষ্টভাবেই দুটি পৃথক ভূবন। ভাষা সংস্কৃতির ও আবহাওয়ার দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইংরেজদের বিতাড়নের জন্য আমরা বলেছিলাম – 'কুইট ইন্ডিয়া' এখন হিন্দুস্তানীদের হটাবার জন্য বলতে হবে 'কুইট বেঙ্গল'। "তোমার আমার ঠিকানা গঙ্গা–মেঘনা–যমুনা" এটা হবে একুশ শতকের শ্লোগান। যে বাংলাকে মোগলরা বলতো "জাতি সমূহের স্বর্গ" তা সত্যিই 'স্বর্গরাজ্য' ছিল – সম্পদে আর প্রাচুর্যে। আত্মবিনাশী তৎপরতা ও আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলে আমরা সে স্বর্গ স্বেচ্ছায় হারিয়েছি। সে স্বর্গ অবশ্যই পুনরুদ্ধার করতে হবে। ইংরেজ আর অবাঙালী হিন্দু–মুসলিম নেতাদের প্ররোচনায় আমরা মাতৃঘাতী দাঙ্গায় লিপ্ত হয়েছিলাম মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য আর সেই কলংকজনক আত্মকলহ হাজার বছরের ইতিহাস পাল্টে দিল। ঐক্যের জন্য সংগ্রাম না করে আমরা অনৈক্যের জন্য মারামারি করলাম স্বজাতির মধ্যেই। পাঞ্জাবী, গুজরাটি, মাড়োয়ারী ও ইসমাইলীরা তখন হেসেছিল। নেহেরু, প্যাটেল, গান্ধীর মত জিন্নাহ, লিয়াকতরাও সেদিন হেসেছিল, বাঙালীর নির্বুদ্ধিতায়, বাঙালীর আত্মহননে। বঙ্গচিত্র তাই আজ ব্যঙ্গ চিত্রে পরিণত। নিম্ন বর্ণিত ৩ (তিন) টি স্তর লক্ষণীয়ঃ–

১। বাংলার মহাসংকট ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের সময় একবার দেখা দেয় – তারপর,
২। ১৯০৫ সনে আরেকবার (সেটা মহাজাগরণের ও ক্রান্তি কাল)
৩। তার পর ১৯৭১ সনে তৃতীয়বার – সেটা স্বাধীনতা ও আংশিক মহাজাগরণের আর এক অধ্যায়।

'বাংলাদেশ হজম হয়ে যাবে ভারতের পেটে' – পাকিস্তানীদের ঐ আশংকা ও প্রচারণা মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে। বরং পশ্চিম বাংলাদেশ হজম হয়ে যাবে বাংলাদেশের পেটে – এটাই ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক সত্য। সব রাজনীতি বিসর্জন দিয়ে যদি আমরা শুধু বঙ্গনীতি (বা প্যান বেঙ্গলিজম) করি তাহলে অচিরেই পশ্চিমবাংলা ও (বাংলাদেশর মত) দুর্ভেদ্য দূর্গ হয়ে যাবে (বাংলা কালচার ও ন্যাশনালিজম এর)। "বঙ্গবাদ" হবে আমাদের একমাত্র জিকির – শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে ভ্রমণে, কল্পনায় ও বাস্তবে, সমরে ও শান্তিতে।

১৭৫৭ সনে গ্রেট ব্রিটেন দখল করেছিল গ্রেট বেঙ্গলকে কিন্তু প্রায় দুই শতাব্দী পর ১৯৪৭ সনে এ দখল ছেড়ে দেবার সময় গ্রেট বেঙ্গলকে দুটি স্মল বেঙ্গল এ ভাগ করে গেল ব্রিটিশ শাসকরা। এ কাজে ব্রিটিশদেরকে সাহায্য করেছিল মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের আবাঙালী নেতৃত্বের হাই কম্যান্ড। গুজরাট আর উত্তর প্রদেশের জিন্না, গান্ধি, নেহেরু বাংলার রাজনৈতিক গতিধারা নিয়ন্ত্রণ করতেন রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমে। আর বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও বাংলার নেতারা অপেক্ষা করে থাকতেন – কখন বাংলার সীমানার বাইরে থেকে তাদের অবাঙালী রাজনৈতিক গুরুদের নির্দেশ আসবে। তাদের স্বকীয়তা বা

আত্মবিশ্বাস বলে কিছু ছিল না। আমাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও গতিধারা স্বচালিত বা স্বনির্ধারিত ছিল না - ছিল পরচালিত ও পরনির্ধারিত। এটাই হচ্ছে সর্ববঙ্গীয় নেতৃত্বের শূন্যতার ট্রাজেডি। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ এই ৫ বছরে বাংলার ইতিহাসের দুইটি মহাসংকট দেখা দেয়। যখন বিশুদ্ধ বঙ্গভিত্তিক নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি তখনই নেতৃত্বের মহাশূন্যতা বাংলার ইতিহাসকে গ্রাস করে। দুইটি মহাসংকট হলো ১৯৪৩ এর মহাদুর্ভিক্ষ আর ১৯৪৭ এর বঙ্গবিভাগ। এই দুইটি সনেই অনেক বাঙালীর অকালমৃত্যু ঘটে দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গায়। আর এই দুটি মহাঘটনা ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় সোহরাওয়ার্দী নেতৃত্ব বিতর্কের সম্মুখীন হয় হিন্দু বাঙালীদের কাছে। বাংলা বিভাগের পক্ষে বেশি সংখ্যক হিন্দু সদস্যের ভোট দেয়ার অন্যতম কারণ হলো এ দুটি দুর্যোগ - যা মানব সৃষ্ট। একমাত্র সুভাস বসুর বাংলা পার্টি, শেরেবাংলার প্রজাপার্টি ছাড়া সর্ববঙ্গীয় কোন রাজনৈতিক দল ছিল না। সবগুলো দল ছিল সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। বসুর তিরোধান আর শেরেবাংলার প্রজাপার্টি কংগ্রেসের সহযোগিতা না পেয়ে বাধ্য হয় লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে। কংগ্রেস ও হিন্দুদের বৈরিতা ফজলুল হককে ঠেলে দিয়েছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার রাজনীতির দিকে- যা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার সহায়ক ছিল না। আর এতে হাত ছিল গান্ধীর যিনি কিছুতেই বাংলা কংগ্রেসকে অনুমতি দিলেন না ফজলুল হকের প্রজাপার্টির সাথে কোয়লিশন সরকার গঠন করতে। যদি অনুমতি দিতেন তাহলে ইতিহাসের গতিধারা সমূলে পাল্টে যেতো এবং ভারত বাংলা কোনটাই ভাগ হতো না। খুব সম্ভবতঃ কেবিনেট মিশন পরকল্পনাই বাস্তবায়িত হতো এবং 'বেঙ্গল-আসাম' অঞ্চল নিয়ে একটি পৃথক, স্বাধীন, সার্বভৌম দেশ জন্ম নিতো।

তবে দাঙ্গা পরবর্তী পশ্চিমবাংলার হিন্দু নেতৃত্বের মধ্যে এতো ভয় ও অস্থিরতা দেখা দেয় যে, ভাল করে ভেবে চিন্তে তারা কাজ করেননি কিংবা করতে পারেননি। এমনকি লাহোর প্রস্তাব মেনে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ বাংলার স্বার্থে যদি হিন্দু বাঙালীরাও আপাততঃ পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত হতে রাজি হতো - তাহলো সেটা তাদের স্বার্থে সবচেয়ে দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় হতো। তাদের বুঝতে পারা উচিত ছিল যে ঐক্যবদ্ধ বাংলার সাথে পশ্চিম পাকিস্তান কিছুতেই পেরে উঠবে না। নবজাত রাষ্ট্রটির পূর্বাঞ্চলের লোকসংখ্যা পশ্চিমের দ্বিগুণ থাকতো আর তাতে করে বাঙালীর মুক্তি আসতো ১৯৭১ এর অনেক আগে- হয়তোবা ১৯৬১ সনের মধ্যেই অর্থাৎ সাম্প্রতিক স্বাধীনতা যুদ্ধের এক যুগ আগেই সর্বাত্মক স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হতো। এমনকি ভোটাভুটির মাধ্যমেও গোটা বাংলা পাকিস্তান থেকে আলাদা হ'তে পারতো; এমনকি সংখ্যালঘিষ্ঠ পাকিস্তানই উল্টো স্বাধীনতা চাইতো; বলতো "ছেরে দে মা কেঁদে বাঁচি। বৃহত্তর যুক্ত বাংলা ১৯৪৭ সনে পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার অর্থ যে কি তা যে কোন সাধারণ মাপের নেতাও আঁচ করতে পারতেন কিন্তু মেধা ও শিক্ষায় উচ্চতর অবস্থানে থেকেও বাঙালী হিন্দুরা ভবিষ্যতের গতিধারা কি হবে তা বুঝতে পারলেন না কেন তা আমার বোধগম্য নয়। মুসলমান বাঙালীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মূলতঃ হিন্দু বাঙালীর ভোটেই বাংলা বিভক্ত হলো ২০ শে জুন ১৯৪৭ সনে এটাই অত্যন্ত অসঙ্গত ও স্ববিরোধী বলে মনে হয়েছে

আমলেরও প্রথমদিকে উপমাহাদেশ এর সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল। ব্রিটিশদের ক্রমাগত ভেদনীতির ফলে (পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার মধ্যে) পূববাংলার অর্থনৈতিক দুর্গতি ঘটে। এই ভেদনীতির ফলে পূর্ববাংলা কৃষিপ্রধান ও পশ্চিমাবাংলা শিল্প প্রধান অঞ্চল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

প্রায় দুই কোটির মত অহমীয় ও উড়িয়া আছে যারা এপার বাংলার বাঙালীদের রক্ত সম্পর্কের ভাই। তারা ভারতের বিহার উড়িষ্যার নিকট বাস করে। এরা যে ভাষায়কথা বলে তাও বাংলার কাছাকাছি। বাংলাদেশের বাঙালীদের সঙ্গে ভারতীয় সীমান্তের ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয় এবং অরুনাচল প্রদেশ এর অধিবাসীদের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ মিলে যায়।

নির্মম রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিণতিতে এই বাংলায় একই জাতির ৫৫% ভাগ বাস করে আর ৪৫% ভাগ বাস করে প্রতিবেশী অঞ্চলের ভারতীয় সীমানার মধ্যে। এই প্রাচীর অদূর ভবিষ্যতে ভেঙে পড়তে বাধ্য । কারণ সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে একজাতি-একদেশ হিসেবে সৃষ্টি করেছিলেন। প্রকৃতির লক্ষণ ও বৈশিষ্ঠ্য অনুযায়ী সত্যিকার হিন্দুস্তান শুরু হয়েছে পশ্চিম এর উত্তর প্রদেশ এর পূর্ব সীমানা থেকে। তার পূর্বের সমগ্র অঞ্চলটাই “বঙ্গবলয়” বা বাংলাজগত। সুদূর অতীতে বেনারসেই ছিল বাংলার ও ভারতের সীমান্তবর্তী লিয়াঁজো অফিস – অনেকটা বৈদেশিক দপ্তরের মত – যা বাংলা রাজ্য ও ভারত রাজ্যের মধ্যে লোকজনের বহির্গমন ও অন্তর্গমন নিয়ন্ত্রণ করতো – দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় করতো। কারণ বাংলা রাজ্যের মুদ্রা ভারত রাজ্যের মুদ্রা থেকে আলাদা ছিল। রমেশ চন্দ্র মজুমদার এর লেখা “বাংলার ইতিহাস” থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়।

পাঞ্জাব-রাজস্থান থেকে শুরু করে পূর্বদিকে উত্তর প্রদেশ এর পূর্ব সীমানা পর্যন্ত বিরাট এলাকা একই ধরনের শুষ্ক আবহাওয়ার দেশ। এ অঞ্চলে বৃষ্টি বাদল কম। খাকী রং এর দেশ আর ফর্সা রং এর মানুষ। অনেকটা মধ্যপ্রাচ্যের মত।

তার ঠিক বিপরীত হলো বঙ্গমন্ডলীয় আর্দ্র অঞ্চল – বৃষ্টিবহুল এবং সুজলা – সুফলা। সবুজ রং এরদেশ। বাদামী ও কালো রং এর মানুষ। পৃথিবীর বৃহত্তম ও উর্বরতম বদ্বীপ এলাকা গড়ে উঠেছে বাংলায়।

লুঙ্গি আর ধুতি; পানি আর জল; দাঁড়ি আর টিকির ব্যবধান এতোটা অনতিক্রম্য নয়, যতটা আমরা ভাবি। গ্রীষ্মমন্ডলীয় আবহাওয়া “ভারতকে বঙ্গমন্ডলীয় আবহাওয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি সত্ত্বা দান করেছে এবং “ভারতমন্ডলকে” বঙ্গমন্ডল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলেছে। যে এলাকার আবহাওয়া সংস্কৃতি, ভাষা বাংলাদেশ এর সাথে একেবারেই অভিন্ন – রাজনৈতিক দুর্ঘটনা ও চক্রান্তে তা বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল পঞ্চাশ বছর আগে। বর্তমানে বাংলার অন্তর এক, দেহ দুই। অনেক আগে রবীন্দ্রনাথ স্বখেদে বলেছিলেন বাংলার দেহ এক কিন্তু অন্তর দুই। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের জন্মস্থান কলিকাতা। বাংলাদেশের

জাতীয় কবির জন্মস্থানও পশ্চিমবাংলা। কলিকাতার লোকেরা দূরদর্শনের চেয়ে ঢাকা টেলিভিশনের অনুষ্ঠান বেশি দেখে। অতীতের অখন্ড বাংলার সংস্কৃতিটাই অখন্ড আছে বলে মনে হয়। অনেকেই বিশ্বাস করেন না, দুই বাংলা আবার এক হয়ে যেতে পারে। কিন্তু হওয়া উচিত, একথা মনে করেন অনেকেই। বাংলাদেশ যদিও জাপান কোরিয়ার তুলনায় দরিদ্র কিন্তু পশ্চিমবাংলার তুলনায় বাংলাদেশ অবশ্যই দরিদ্র নয়। বিশ্বের বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাসের আধার এবং খনিজ সম্পদের ভান্ডার বাংলাদেশ একুশ শতকের সূচনালগ্নে পাকিস্তান-হিন্দুস্তানকে ছাড়িয়ে দক্ষিণ এশিয়ার ধনীতম রাষ্ট্রে পরিণত হতে যাচ্ছে। তখন আসাম এবং পশ্চিমবাংলা ভারতকে ছেড়ে বাংলাদেশের সাথে যুক্ত হতে আগ্রহী হবে - এতে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমানেই বাংলাদেশ সবদিক থেকে যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে উচ্চতর মর্যাদা ও অবস্থানে আছে, পশ্চিমবাংলার তুলনায়। শুধু সাহিত্য, শিল্প, ললিতকলা ও চলচ্চিত্র শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা খানিকটা এগিয়ে আছে।

দূরবর্তী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা যত সহজে সাংস্কৃতিক বিদ্রোহ করতে পেরেছিলাম নিকটবর্তী হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলার লোকেরা এখনও রুখে দাঁড়াতে পারেনি কারণ ভারতে বাঙালীরা হচ্ছে একেবারেই সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ-সারা ভারতের জনসংখ্যার প্রায় নয় ভাগের এক ভাগ, একেবারেই নগণ্য, বিশাল অবাঙালী জনসংখ্যার তুলনায়। এ বাস্তবতা সত্ত্বেও ওখানে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হতে পারে অচিরেই, হিন্দি ভাষা ও সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। পূর্বদিকে ক্রমাগত অগ্রসরমান হিন্দি ভাষা ও সংস্কৃতির কাফেলা হঠাৎ একটা প্রচন্ড ধাক্কা খাবে বাঙালী সংস্কৃতি, ভাষা ও জাতীয়তাবাদের দেয়ালে - যে দেয়াল গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। বাংলাদেশ নির্মিত সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে সাংস্কৃতিক প্রাচীর নির্মিত হবে আবহমান বাংলায় শেষ সীমানা দ্বারভাঙ্গায় তথা দ্বারবঙ্গে যা বাংলার ঐতিহাসিক প্রবেশ পথ।

বাংলাদেশকে তথা পূর্ব বাংলাদেশকে বাংলা সংস্কৃতির শেষ দুর্গ বলা হয় কিন্তু প্রথম দুর্গটি অবশ্য দ্বারভাঙ্গায় অবস্থিত।

এতকাল হিন্দি সংস্কৃতির অভিযানে পিছু হটতে হটতে পশ্চিমবাংলার পরাজিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় নিজেদের দায় মূল বাংলাদেশ ভূখন্ডের উপর চাপিয়ে দিয়ে বলছে একমাত্র বাংলাদেশই পারবে হিন্দি সংস্কৃতিকে পুরোপুরি ঠেকাতে। কিন্তু আমরা যুদ্ধ কৌশলের অংশ হিসাবে পশ্চিম বাংলাদেশকে আমাদের সাংস্কৃতিক যুদ্ধের পশ্চিম সীমান্ত হিসাবে ব্যবহার করতে চাই - বাফার স্টেট হিসাবে- সাংস্কৃতিক বাফার স্টেট। কারণ সুন্দরবনতো পশ্চিম বাংলায়ও বিস্তৃত- রয়েল বেঙ্গল টাইগার তো ওখানেও জন্ম নিচ্ছে অবিরত। পশ্চিমবাংলার যুবশক্তি যদি ব্যঘ্রতা হারিয়ে বিড়ালত্বে সংকুচিত হয়ে গিয়ে থাকে তবে তারা যেন আমাদের জন্য পথ খুলে দেন। আমাদের রয়েল বেঙ্গল টাইগাররা বাংলার পশ্চিম আঙিনা থেকে হিন্দুস্তানী দখলদারদের বিতাড়ন করবে। বাংলার পেছনের আঙিনা হচ্ছে ত্রিপুরা-আসাম আর সামনের আঙিনা হচ্ছে পশ্চিমবাংলা উড়িষ্যা ও বিহার এর বাংলাভাষী অঞ্চল। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার

ছিল। কিন্তু তারাও চাইতেন না গোটা বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হোক। শেরেবাংলাও মনেপ্রাণে চাইতেন বৃহত্তর বাংলা। কিন্তু নিজেই মুসলিম লীগ বনে গিয়ে লাহোর প্রস্তাব এর উত্থাপক হয়ে পরোক্ষভাবে অখন্ড ও স্বাধীন বাঙালী জাতিগঠনের বিপরীত ধারায় চলে গেলেন। এর পটভুমি হলো – ১৯৩৭ সনে বাংলা কংগ্রেস গান্ধীর ইঙ্গিতে শেরে বাংলার প্রজাপার্টির সাথে কোয়ালিশন না করাতে তিনি মুসলিম লীগের সাথে গাঁটছড়া বাঁধতে বাধ্য হন। বাংলা কংগ্রেসকে প্রজাপার্টির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল গান্ধী। এই গুজরাটি নেতার অভিসন্ধি তখনকার বাঙালী নেতারা বুঝতে পারেননি। অর্থাৎ নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসই বাংলা কংগ্রেসকে বাধা দেয় ক্ষমতায় যেতে।

তখন বাংলা কংগ্রেস এর বিগ ফাইভের উচিত ছিল গান্ধী–নেহেরু চক্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং শেরেবাংলার সাথে হাত মিলানো। তাহলে শুধু বাংলা কেন গোটা ভারতও বিভক্ত হতো না। অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীও চাইতেন অবিভক্ত বাংলা। কিন্তু বলিষ্ঠভাবে এবং স্পষ্টভাবে তিনি এবং ফজলুল হক মিঃ জিন্নাহ্‌কে বলতে দিধা করেছেন যে, ভারতবর্ষের একেবারে পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চল "বাংলা–আসাম' এর জন্যে ভারতবর্সের সবচেয়ে পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত পাকিস্তান এ অর্ন্তভূক্ত হওয়ার কোন যুক্তি বা প্রয়োজন ছিল না – নিজেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বায়ত্তশাসিত, স্বাধীন ও সার্বভৌম এলাকা হিসেবে থাকতে পারতো "বঙ্গাসাম" অঞ্চলটি। এহেন বলিষ্ঠতা ও স্পষ্টতার অভাব বাংলা–আসাম এর রাজনীতিতে ভয়াবহ শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল – অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল নেতৃত্বের শূন্যতা ছিল যা উল্টাপক্ষ পুরণ করেছিল ধ্বংসাত্মক কায়দায়। খাজা নাজিমউদ্দিন, মাওলানা আকরাম খাঁ এবং ডঃ শ্যামপ্রাসাদ মুখার্জী ও লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রেয়র মতো নেতারা ধর্মীয় সম্প্রীতির পরিবর্তে ধর্মবিদ্বেষের জন্ম দিয়েছিলেন। কলিকাতা ও নোয়াখালীর দাঙ্গা দমনে লীগ সরকারের ব্যর্থতা ও অযোগ্যতা অবিভক্ত বাংলার মুসলমান প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকাকে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিল। পরবর্তীকালে এপার বাংলার আলোর দিশারী নির্ভেজাল বাঙালী জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে মাওলানা ভাসানী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা ছিল পরিষ্কার এবং প্রশ্নাতীত। শুধু একটামাত্র জটিলতা বা বিভ্রান্তি তারা নিরসন করতে পারেননি – তাহলো বাঙালীর সামগ্রিক জাতীয় উত্থানে ও স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুবাংলা ও সংশ্লিষ্ট হবে না কি নিস্ক্রিয়ভাবে ভারতের অংশ হিসেবেই পশ্চিমবাংলা থাকবে, না কি তাকেও স্বাধীনতার স্রোতোধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে, এ নিয়ে নেতৃত্বের কোন সুস্পষ্ট দিক–নির্দেশনা ছিল না – অবশ্য সেটা ২৫শে মার্চ ১৯৭১ এর ঘটনার পর দ্রুতগতিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয় ছিল না – বিশেষ করে যখন বাংলাদেশ এর জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব অসহায়ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাহায্য ও সহযোগিতার উপর। এর জন্য কেউ দায়ী নয়। দায়ী আমাদের জাতির নিয়তি। প্রবল ঘটনাপ্রবাহই নেতৃত্বকে একটি লক্ষ্যের পানে নিয়ে যায় (১৯৭১সনে) – নেতৃত্ব ঘটনাপ্রবাহকে টেনে নিয়ে যেতে পারেনি অন্য কোন লক্ষ্যের পানে । আমাদের নেতৃত্ব অনেক পূর্ব থেকে প্রস্তুত ছিল না অনিবার্য ঘটনাপ্রবাহের জন্য। বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল সংকীর্ণতায় সীমাবদ্ধ।

আমরা যদি পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের উদ্দীপ্ত এবং উদ্বুদ্ধ করতে পারতাম (মুক্তির চেনতায়) কমপক্ষে একযুগ আগে থেকে তাহলে শুধু কলিকাতার সাহায্যেই আমরা দেশ স্বাধীন করতে পারতাম (দিল্লীর ভূমিকা অপরিহার্য ছিল না) সামরিক সাহায্য আসতো বার্মা, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং চীন থেকে । অবশ্য চীন তৎকালীন পূর্ববাংলার আওয়ামী লীগকে সাহায্য করার জন্য এতোটা আগ্রহী হতো না কিন্তু পশ্চিমবাংলার মুক্তি সংগ্রামকে অবশ্যই সর্বান্তকরণে সাহায্য করতে রাজি হতো। কারণ ভারত থেকে বিচ্ছিন্নতা প্রয়াসী পশ্চিমবাংলা এবং স্বাধীন বাংলাদেশ একত্রিত হয়ে একই স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রে গঠন করলে চীনের স্বার্থে তাহতো এক বিরাট সাফল্য। বৃহত্তম বাংলা ও ক্ষুদ্রতর ভারতবর্ষ চীনের সামরিক ও বাণিজ্যিক স্ট্র্যাটেজীকে সবচেয়ে বেশী মজবুত করতে পারতো। আসলে উত্তর-পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের “স্বর্গ” হচ্ছে অখন্ড বাংলা-আসাম অঞ্চল - যা সম্ভব হবে আসাম এর ৭ ভাগ এবং বাংলার ২ ভাগকে একত্রিত করার মাধ্যমে।

বাঙালী জাতির দুই ভাগের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর আপোষহীন সংগ্রাম ও সুস্পষ্ট নীতি বাঙালী জাতির বেশি অর্ধেক অংশকে মুক্ত করছে - কম অর্ধেক অংশ পশ্চিমবাংলা এখনও ভারতাধীন একটি প্রদেশ মাত্র। বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের কোন পরিকল্পনা কিংবা তা বাস্তবায়নের জন্য কোন কর্মসূচী গ্রহণের আহবান তিনি জানাতে পারেননি খোলাখোলিভাবে কেননা তিনি ছিলেন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী এবং ঐ সরকার এর প্রধান, যে সরকার ভারতের সাথে ২৫ বছরের মৈত্রীর একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে। কৌশলগত সীমাবদ্ধতার কারণে তখন তার পক্ষে ভারত সরকারের স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু বলা বা করা সম্ভব ছিল না এবং সেটা ঠিক বা সময়োপযোগীও হতো না। তিনি তার ভূমিকায় সঠিক অবস্থানে ছিলেন বলেই মনে করি।

ভাসানী অবশ্য পল্টন ময়দানে দাঁড়িয়ে খোলামেলা বলে দিয়েছিলেন পশ্চিমবাংলার লোকদেরকে “আমরা যদি ইসলামাবাদ ছাড়তে পারি তো আপনারা দিল্লী ছাড়তে পারবেন না কেন?” মাওলানা ভাসানীর এ আহ্বান এর পেছনে পরোক্ষভাবে সকলেরই প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল - একথা আমরা বুঝতে পেরেছিলাম।

বঙ্গবন্ধুর একটা মস্তবড় ভুল ছিল। যদি প্রধানমন্ত্রী না হয়ে জাতির জনক এর আসনেই থেকে যেতেন তাহলে শুধু এপার বাংলার পিতা নয়, ওপার বাংলারও পিতা হতে পারতেন। তার নিজের লোকেরা যেভাবে দলীয় স্বর্থে তাকে ব্যবহার করেছিলেন তা থেকে তিনি মুক্ত থাকতে পারতেন এবং সর্বদলীয় সর্ববঙ্গীয় সার্বজনীন বাঙালীর নেতা হিসেবেই বিকশিত হতেন - শুধু আওয়ামী লীগের নেতা হয়ে নিজেকে খন্ডিত করার কোন প্রয়োজন ছিল না বঙ্গবন্ধুর মত ব্যক্তিত্বের। পাকিস্তানী আমলে পূর্ববাংলা যেমন ছিল পাঞ্জাবীদের বাগানবাড়ী তেমনি পশ্চিমবাংলা আজ মাড়োয়ারী-গুজরাটিদের বাগানবাড়ীতে পরিণত হয়েছে হিন্দুস্তানী শাসনের যাঁতাকলে। একথা কে না জানে যে, বাংলা মোগল আমলে এবং ব্রিটিশ

স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে ছিল অতীতে তা প্রমাণ করেছে মোগল আমলে এবং মুসলীম শাসনামলে প্রায় ছয়শত বছর স্বাধীন থেকে। স্বাধীন যুক্তবাংলা তো নতুন কোন ব্যাপার নয় – ইংরেজ পূর্ব ভারতবর্ষে যুক্ত বাংলা স্বাধীনই ছিল – এক ও অভিন্ন ছিল। ইংরেজ পরবর্তী সময়েও যুক্ত বাংলাকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারা উচিত ছিল কিন্তু আমাদের তৎকালীন নেতৃত্ব নিজেই দ্বিখন্ডিত ধারায় চলতে শুরু করে।

কাজেই পুরাতন বাংলাকেই আমরা ফিরে পেতে চাই – যা ছিল দিল্লীর প্রভাব মুক্ত। যে স্বর্গ আমরা হেলায় হারিয়েছি – তা ফিরে পেতে মহাসাধনা, মহাসংগ্রামের প্রয়োজন। অস্ত্রের শক্তি নয় বরং আত্মার শক্তিই বাংলার সকল খন্ডকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিবে। সেই আত্মার শক্তি সৃষ্টি করতে পারবে যে মহানায়ক তারই ডাকে সাড়া দেবে মহাজাতি বাংলা – উত্তরে দক্ষিণে, পূবে-পশ্চিমে সব বাঙালী একাকার হবে সেদিন। ২১ শতকের বাংলা হবে মিলিত বাংলা – খন্ডিত বাংলা নয়।

প্রাক ব্রিটিশ যুগেও বাঙালীরা এক পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন জাতি ছিল এবং দেশ হিসাবেও অবিভক্ত এবং অখন্ড ছিল। প্রায় সুদীর্ঘ সাড়ে পাঁচশত বছরের মুসলিম শাসনামলে বাংলার শাসকরা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন এবং প্রায় সাড়ে তিনশত বছরই স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন। একইভাবে বৌদ্ধ এবং হিন্দু যুগেও বাংলার স্বাধীনতা বজায় ছিল বেশিরভাগ সময়।

বাঙ্গালী জাতি তার ইতিহাসের কোন পর্যায়েই আর্যাবর্তের অধীনতা সম্পূর্ণভাবে মেনে নেয়নি। দ্বাপড় যুগে বঙ্গাধিপতি বাসুদেব এবং জরাসন্ধ কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধে নেমেছিলেন। মহাভারতে এর উল্লেখ আছে।

ব্রিটিশ প্রথম ভারতবর্ষে তথা বাংলায় আগমনের পর দেখতে পায় বিহার উড়িষ্যা এবং বাংলার লোকেরা মিলে একটা স্বতন্ত্র ধরনের রাষ্ট্র গঠন করেছে – যা ভারতবর্ষ থেকে স্বতন্ত্র। বাংলা রাষ্ট্রের সাথে মোগল সাম্রাজ্যের সম্পর্ক এতো ক্ষীণ ছিল যে, তাকে কোন সম্পর্কই বলা যায় না। সেই মহাবাংলার রাজধানী প্রথমে ছিল মুর্শিদাবাদ – পরে হয় ঢাকা। এ কারণে বাংলাদেশের বাঙালীদের সাথে ভারতীয় সীমান্তের আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং অরুনাচল রাজ্যের লোকদের ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ মিলে যায়। বাংলার ভাগ তাই রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক নয়। সাম্প্রদায়িককতার বিষবাষ্পে প্রভাবিত হয়ে প্রকৃতির দেয়া সীমানাকে আমরা কেটে ছেঁটে ছোট করে ফেলেছি। বাঙালী জাতি পৃথিবীর প্রাচীনতম সুসভ্য জাতিগুলোর অন্যতম। আর্যজাতির ভারতবর্ষের আগমনের অনেক আগে থেকেই বাংলার আদিম অধিবাসী অস্টারিকগণ এক উন্নত সমাজ ব্যবস্থার পত্তন করতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলা অঞ্চল মুসলিম শাসনামলের শেষদিকে এবং ব্রিটিশরাজ এর সূচনা লগ্নে বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল। আর ব্রিটিশরাজ এর সমাপ্তির লগ্নে বাংলা বিশ্বের সবচেয়ে গরীব

এলাকায় পরিণত হয়।

একথা উল্লেখ্য যে, গাঙ্গেয় লোকদের হাতেই আলেকজান্ডার দি গ্রেট এর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। টলেমী নামক বিখ্যাত গ্রীক পন্ডিত ও ইতিহাসবিদ এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

নদীয়ার জমিদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চক্রান্তে ও পরামর্শে মীরজাফর বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে পলাশীর রণক্ষেত্রে বাঙালী সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে ইংরেজ সেনাবাহিনী জয়ী হয়নি – জয়ী হয়েছে ষড়যন্ত্র। বাঙালী সেনারাও পরাজিত হয়নি – পরাজিত হয়েছে দেশপ্রেম যার ঘাটতি হওয়াতে বঙ্গশিবিরে ভাঙ্গন দেখা দেয় – আন্তরিকতা ও ঐক্যের অভাবে। ক্ষমতা অর্থ আর প্রতিপত্তির লোভ বিশ্বাসঘাতকের হাতকেই শক্তিশালী করেছিল। ইংরেজরা যে বিশ্বাসঘাতকতাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য, পলাশীর ট্রাজেডী তার জলন্ত প্রমাণ। ফরাসী, ওলান্দাজ, পর্তুগীজরাও সম্পদের লোভে বাংলায় এসেছিল কিন্তু তারা এ রকম জঘন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি। ইংরেজরা বাঙালী জাতিকে প্রায়ই বিশ্বাসঘাতক বলে গাল দেয়। কিন্তু ১৭৫৭ সনে বিশ্বাসঘাতকতার প্রথম পাঠ তারাই শিখিয়েছিল রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, উঁমিচাদ, জগতশেঠ, মীরজাফর, ঘসেটি বেগম এদেরকে। ইংরেজ রাজশক্তি সুযোগ বুঝে উচ্চবর্ণের অল্পসংখ্যক অভিজাত হিন্দুকে নিয়ে এমন একটি কলিকাতা কেন্দ্রীক সুবিধাভোগী জমিদার, মহাজন ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গড়ে তোলে যারা একসময় গোটা বাঙালী জাতির মুখপাত্র হয়ে উঠে। কোটি কোটি বিত্তহীন মানুষের সাথে তাদের সম্পর্কের একমাত্র ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক শোষণ আর নেতৃত্বের নামে প্রতারণা।

উনিশ শতকের রেঁনেসা মহাজাতি বাঙালীর বৃহত্তর অংশের অন্ধকার দূর করতে পারেনি। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা শুধু ইংরেজের আলোকে আলোকিত হতে চেয়েছিল – অনেকটা প্রতিফলিত গৌরব অর্জনের মত – ইংরেজীতে যাকে বলে 'রিফ্লেক্‌টেড গ্লোরি'। নড়হরি কবিরাজ এর লেখা বাংলার কৃষক বিদ্রোহ' তার দলিল। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালী' তার আর একটি উল্লেখযোগ্য বই। আসলে উনিশ শতকের রেঁনেসা ছিল বাঙালী হিন্দুর জাগরণ – বিশ শতকের রেঁনেসা হবে হিন্দু-মুসলমান বাঙালীর মিলিত মহাজাগরণ। সেই গ্রেট রেঁনেসার পদধ্বনি আমরা শুনতে পাচ্ছি। কলিকাতার দেয়ালে শ্লোগান দেখা যাচ্ছে 'হিন্দি হটাও, বাংলা বাঁচাও'।

ভারত ভূখন্ডে বৃটিশ সাম্রাজ্য সংহত করার লক্ষ্যে ব্রিটিশরা এর ভৌগোলিক তাৎপর্য ও বিশালতাকে উপেক্ষা করে কখনও দেশ, কখনও উপমহাদেশ নামে অভিহিত করেছে – শুধু ভারতবর্ষের মহাদেশীয় বৈশিষ্ট্যকে এড়ানোর উদ্দেশ্যে। যে বিচিত্র বিশাল ভূখন্ড ইংরেজ এর বাগানবাড়ী হতে যাচ্ছে উপনিবেশ এর ক্ষুদ্র মর্যাদায় তাকে 'মহাদেশ' এর মর্যাদা দিতে

চাইতো না শ্বেতাঙ্গ ইংরেজরা। ভারতবাসীরা তাই ভাগ্যের সহযাত্রী হয়েছিল জওহেরলাল নেহেরুর কথামতো। 'নিয়তির অভিসার' এমনি বিচিত্র যে বার্মিজদেরকেও ভারতীয় নাগরিক হতে হয়েছিল এবং বাঙালীদেরকেও ভারতীয় নাগরিক পরিচয় ধারণ করতে বাধ্য করে ইংরেজ এবং তার দোসর নেহেরু-প্যাটেল জুটি। ১৯৩৭ এর আগে বার্মা ব্রিটিশ ভারতের অধীন একটি রাজ্য ছিল বাংলার মত। যে ঐতিহাসিক নিয়তির কথা নেহেরু বলেছিলেন তার ভাগ্য বিধাতা তিনি নিজেই ছিলেন - প্যাটেল তার সহযোগী ছিলেন। আসলে ভারত ছিল একটি মহাদেশ, যার মধ্যে ছিল অনেক দেশ, অনেক জাতি। আজও ভেতরে ভেতরে সে অবস্থা বিরাজমান তবে কথাকথিত কৃত্রিম ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বহিরাবরণে। অথচ ইংরেজরা এই বিশাল ভূখন্ডকে 'একজাতি' বলতে পছন্দ করতো। মোগলদের 'হিন্দুস্তান' নামের অনুকরণে 'ইন্ডিয়া' নামটি তারা দেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারত ছিল 'বহুদেশ-বহুজাতি' সম্বলিত একটি মহাদেশ। অনেকগুলো দেশ মিলে যা হয় তার নাম মহাদেশ, উপমহাদেশ নয়। বিভিন্ন দেশকে ক্ষুদ্রায়িত করে ইংরেজরা প্রদেশ এর রূপ দেয় যাতে করে দিল্লীতে বসে সব প্রদেশকে শোষণ এবং শাসন করা যায়।

শ্রীলংকা আর বার্মা অখন্ড আকৃতিসহ ব্রিটিশ ভারত থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম হয়ে গেল অথচ এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাদীপ্ত জাতি হয়েও বাংলা তা পারলো না - নেহেরুর নিয়তির অভিসারে ভারতী দেবীর ছলনাময় প্রেমে বিভোর হয়ে গিয়েছিল বাংলার নায়করা।

প্রাচীন ভারত একটি মহাদেশ এর সমতুল্য মর্যাদা নিয়েছিল। প্রাচীন মর্যাদাই আবার ফিরে পাবে ভারতবর্ষ কিন্তু দেশ হিসাবে নয় - মাহদেশ হিসেবে। বিশ্বসংস্থা বা জাতিসংঘ তাকে এ মর্যাদা দিতে বাধ্য হবে, যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের মত ভারত বর্ষ ভেঙ্গে কম পক্ষে ১৫টি জাতি ও দেশ এর বিকাশ ঘটবে। "ভারত মহাদেশ" এর কনসেপট্ বা ধ্যান-ধারণাই ভারতাধীন বিভিন্ন রাজ্যগুলোর আশা-আকাঙ্খা এবং জাতিগত সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান দিতে পারে যার সম্ভাবনা ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান এর মধ্যেই অন্তর্নির্হিত ছিল। একমাত্র মাওলানা আজাদ এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সর্বান্তকরণে।

বৈদিক যুগে ভারতবর্ষ কিংবা ভরতের রাজ্য 'ভারত' বলতে আর্যাবর্ত্তের যে অঞ্চলকে বুঝাতো বঙ্গদেশ, ব্রহ্মদেশ এবং শ্যামদেশ নিঃসন্দেহে তার বাইরে ছিল অর্থাৎ বাংলাদেশ তখন আর্যবলয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আসলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এর জনক হলো ব্রিটিশরাজ। এ প্রসঙ্গে মিঃ সেলভংকর এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য - "অন্ধভাবে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংরেজ শাসক গোষ্ঠি নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই এরূপ অবস্থায় সৃষ্টি করেছিল যা হতে ভারতীয় আধুনিক জাতীয়তাবাদ জন্মগ্রহণ করেছে।" ডঃ আম্বেদ কর কর্তৃক রচিত ভারতের শাসনতন্ত্র নিজেই "ভারতবর্ষকে একটি বহুজাতিভিত্তিক দেশ" বলে ঘোষণা করেছে।

প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছরের মুসলিম শাসনামলে বাংলায় কোন দাঙ্গা হয়নি অথচ মাত্র দুইশত বছরের ইংরেজ আমলে বহু দাঙ্গা হয়েছে। ইংরেজ আমলে বাংলার মুসলমানদের বঞ্চিত করা হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

বাংলার পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন – " যে রাজপ্রাসাদ এতোদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমান এর ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্নমনে প্রার্থণা করি।" কবি গুরুর মন্তব্য তখনকার বাঙালী মুসলমানের দৈন্যদশাকেই তুলে ধরেছিল।

হাজার হাজার বছর আগে মিশরের মমিগুলোর আচ্ছাদন ছিল বাংলার উৎপাদিত বিখ্যাত মসলিন কাপড়ের তৈরি। এ থেকে সুদুর অতীতের সমৃদ্ধির কথা জানা যায়।

কিভাবে ব্রিটিশ আমলে বাংলাকে ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে ছোট করা হয় তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে সময়ানুক্রমিক বিশ্লেষণ থেকে। ব্রিটিশ আমলে একটি পৃথক প্রদেশরূপে বেঙ্গল বা বঙ্গদেশের সৃষ্টি হয় ১৯৫৪ সনে। তার অর্ন্তগত ছিল আরাকান, আসাম (সুরমা উপত্যাকা) ত্রিপুরা, ছোটনাগপুর, কুচবিহার, উড়িষ্যা ও বিহার অঞ্চল। বঙ্গদেশ বা বেঙ্গল গঠনের ২০ বছর পর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে একটি সরকারী গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে বাংলা থেকে আলাদা করে 'আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। বাংলার এই অসম (উচুনিচু) অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলাতে অতীতের বিশালবঙ্গ ছোট হয়ে যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে বঙ্গদেহের অঙ্গ কেটেই 'আসাম' গঠিত হয়। এর প্রায় ৬০ বছর পর ১৯৩৫ সনে বিহার এবং উড়িষ্যাকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে কেটে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং পৃথক দু'টো প্রদেশের মর্যাদা পায় ওরা। এ সময়ে বাংলা অনেক ছোট হয়ে যায়। এর মাত্র দুই বছর পর ১৯৩৭ সনে 'আরাকান' রাজ্যটি বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বার্মার সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়। এর ১০ বছর পর ১৯৪৭ সনে লর্ড মাউন্টব্যাটন এবং নেহেরু–প্যাটেল চক্র ইতিমধ্যেই ক্ষুদ্রায়িত বাংলার অবশিষ্ট অংশ কেটে দুঁভাগ করে একভাগ পাকিস্তানের সাথে – বাকি আর একভাগ হিন্দুস্তানের সাথে জুড়ে দেয়। এর ফলে ১৯৪৭ সালেই শাশ্বত বাংলার অবলুপ্তি ঘটে স্বাধীন দেশ হিসেবে। আমি তাই ১৮৫৪ সনের বিশাল প্রাচীন বাংলাকেই ফিরে পেতে চাই। এই চাওয়ারই আরেক নাম হলো 'বঙ্গবাদ'। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সর্বভারতীয় রাজনীতির অশুভ প্রতিফলন বাংলার উপর ব্যাপকভাবে পড়েছিল। এ বিষয় শেরেবাংলার মনোভাব প্রকাশ করে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ঃ– "In the worst days of communal riots in Bengal he proposed to Jinnah that from the beginning to end interest of Bengal was sacrificed at the altar of all India Policy of the Congress & Musilim League." । ১৯১৪ সনে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' – প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা ছিল বিশুদ্ধ বঙ্গভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

১৯৪০ সনে শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হক উত্থাপন করেছিলেন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক দুইটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রস্তাব। কিন্তু দুঃখের বিষয় লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের দীর্ঘ ৬ বছর পর ১৯৪৬ সনে মিঃ জিন্নাহর নির্দেশে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দিল্লী প্রস্তাব উত্থাপন করে রাষ্ট্রসমূহের বদলে মাত্র একটি মুসলিম সংখ্যাগুরু রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব পাশ করালেন – যার ফলে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার সম্ভাবনা তখনকার মতো বিলুপ্ত হলো। এ কারনেই মূলতঃ ১৯৪৭ সনের বেঙ্গল পার্টিশন এর মতো দুঃখজনক ঘটনা ঘটে।

অবিভক্ত বাংলার পক্ষে লীলা রায়, শ্রী কামাথ

১৫ই এপ্রিল, ১৯৪৭ বাংলার 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পার্টির নেত্রী শ্রীমতি রায় তাঁর ঢাকা জেলা সফর ও জনসভায় বক্তৃতার সময় এক বিবৃতিতে বলেন, "বঙ্গবিভাগ দাবীর সমর্থকদের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়।"

একইদিন 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নেতা শ্রী কামাথ বাংলা বিভাগ দাবীর বিরোধিতা করে মন্তব্য করেন, "এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, যে–বাংলা ৪০ বছর আগে বিভাগের বিরুদ্ধে লড়েছিল সে বাংলাই আজ আবার বিভাগের দাবীতে মুখর হয়ে উঠেছে।"

বাঙালী জাতি ১৯৪৭ সনে যেই তিমিরে ছিল আজও সেই তিমিরেই রয়ে গেছে – বরং খন্ডিতরূপে। পশ্চিমবাংলায় আজ মুক্ত বঙ্গসংস্কৃতির কথা বললে বা বিশুদ্ধ বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলনের কথা বললে দিল্লীর চোখে তা হয় সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিকতা। যেমন ১৯৫২ সনে পূর্ববাংলার মানুষ তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার কথা বললে তা হতো আঞ্চলিকতা বা প্রাদেশিকতা, করাচীর চোখে। তখন করাচী পাকিস্তানের রাজধানী ছিল। পরবর্তীতে আইয়ুব খাঁনের আমলে রাজধানী ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত হয়। সেদিন বাঙালী জাতীয়তাবাদকে যারা বলেছিল অন্ধ জাতীয়তাবাদ বা উগ্র জাতীয়তাবাদ তাদেরকে আজ বলা যায় – সেদিনের সেই অন্ধ, সর্বাত্মক জাতীয়তাবাদ বা উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন না করলে আজকের বাংলাদেশ জন্ম নিত না। ঢাকা আজ শুধু বাংলাদেশের রাজধানী নয় সমগ্র বঙ্গ বলয়ের সকল রাজ্যের সাংস্কৃতিক রাজধানী। এটা কম গৌরবের কথা নয়। সাংস্কৃতিক বিজয়ই তো শ্রেষ্ঠ বিজয়।

ইতিহাসের সত্যকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলে একটি জাতি তার বর্তমান ভবিষ্যত সবই হারায়। যুক্তবাংলার একনিষ্ঠ সাধক নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগের এককালের সাধারণ সম্পদাদক জনাব আবুল হাশিমের একটি বক্তব্য ছিল এইরূপ– "সময় এসেছে যখন সত্য যা, তা বলতেই হবে। সস্তা জনপ্রিয়তা ও সুযোগ সন্ধানী নেতৃত্বের মোহে নীচাশয়তার কাছে আত্মসমর্পণ চিন্তার ক্ষেত্রে পতিতা বৃত্তিরই সামিল। সত্যিকার বিপ্লবের পথ আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে

নয়, বরং চিন্তা ও অনুভূতির রাজ্যে বিপ্লব আনয়নে। বস্তুনিষ্ঠ চিন্তার ক্ষেত্রে ভাব প্রবণতার কোন স্থান নেই। চিন্তা রাজ্যের ক্ষণিকের বিকৃতি যেন আমাদের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত না করতে পারে।" আমাদের তথা বাঙালীদের সকল দুর্গতির কারণ একটাই - সত্য উপলব্ধির অভাব। মুক্তবাংলার মহাসাধক শরত বসুর চিন্তাধারাও ছিল একই খাতে প্রবাহিত। এই দুই মহান বাঙ্গালী ব্যক্তিত্বের ঋণ মহাবাংলার মানুষ কোনদিন শোধ করতে পারবে না। বাংলা অখন্ড থাকুক, স্বাধীন-সার্বভৌম থাকুক - এ নীতিতে ও আদর্শে বিশ্বাসী যতো নেতা-নেত্রী আছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী ছিলেন এই দু'জন - আবুল হাশিম এবং শরৎ বসু। শেষমুহূর্ত পর্যন্ত বঙ্গমাতাকে অখন্ড রাখার সাধনায় এ দু'জনের যে ক্লান্তিহীন সংগ্রাম-সাধনা এই মহাজাতির ইতিহাসে তার কোন সমান্তরাল খুঁজে পাওয়া যায় না - ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে কিনা তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানেন। কবি কালিদাস লিখেছেন -

ব্যক্তি ডুবে যায় দলে
মালিকা পড়িলে গলে,
প্রতি ফুলে কে'বা মনে রাখে।

যুক্তবাংলার নেতাদের মালিকায় তখন অনেক ফুলই শোভা পেয়েছিল কিন্তু এ দু'টি ফুলকে আমরা আলাদা করে মনে রাখবো - ব্যক্তি হিসাবে দলের মধ্যে তারা ডুবে যাবেন না, এ বিশ্বাস আমার আছে - ইতিহাসের পুনরাবর্তনে তারা ভেসে উঠবেন বারবার আমাদের স্মৃতির কাননে। চিরদিন সৌরভ ছড়াবে এ দু'টি ফুল-শরত আর হাশিম। ২৪ কোটি বাঙালীর পক্ষ থেকে তোমাদের দু'জনকে আমরা বাঙালীর গণদেবতার আসনে বসিয়েছি। তোমাদের বিদেহী আত্মার প্রতি রইলো আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

লাহোর প্রস্তাব
বনাম
দিল্লী প্রস্তাব

লাহোর প্রস্তাবে উল্লেখিত ' রাষ্ট্রসমূহের ' কথাটির পরিবর্তে দিল্লী প্রস্তাবে শুধু 'রাষ্ট্র' কথাটি ব্যবহার করা হয়, একথা ঠিক। অনেকে মনে করেন এটা তেমন কোন পরিবর্তন বা সংশোধন নয়। কিন্তু আমি মনে করি ব্যাপক পরিবর্তন। কেননা উপমহাদেশের পশ্চিমপ্রান্তে এবং পূর্ব প্রান্তে দুইটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র গঠনের পরিবর্তে একটিমাত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয় দিল্লী প্রস্তাবে এবং এর কারণেই হিন্দু বাঙালীরা (প্রধানত ঃ পশ্চিমবাংলার) এই ভেবে আতঙ্কিত হয় যে, যদি তারা অবিভক্ত বাংলার পক্ষে রায় দেন তবে তা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা না হয় ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের একটি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ মাত্রে পরিণত হবে - অর্থাৎ বাঙালী হিন্দুরা (প্রধানত ঃ পশ্চিম বাংলার) এমন একটি রাজ্যে

যোগ দিতে আগ্রহী হলো না – যা স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা পাবে না (লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনীর ফলে, যে সংশোধনী দিল্লী প্রস্তাবের দ্বারা করা হয়।) ১৯৪৬ সনে দিল্লীতে জনাব সোহরওয়ার্দী কতৃক উথাপিত হয়েছিল এ প্রস্তাব। জনাব আবুল হাশিম এর বিরোধিতা করলে জনাব জিন্না একটা গোঁজামিল দিয়ে তাকে বুঝিয়ে বলেন – "এটা লাহোর প্রস্তাবের কোন সংশোধনী নয় বরং মুসলমানদের আবাসভূমি গঠনের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র গণপরিষদ গঠনের কাঠামো মাত্র।" কিন্তু ১৯৪০ সনের শেরেবাংলার লাহোর প্রস্তাবের রাষ্ট্র কাঠামো ছিল দুইটি বা ততোধিক। আর দিল্লী প্রস্তাবে কাঠামো মাত্র একটি – যার কেন্দ্রবিন্দু ভারতবর্ষের শেষ পশ্চিম সীমানায় অবস্থিত ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানে থাকবে এবং পূর্ব ভারতের শেষ সীমানায় অবস্থিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অখন্ড বাংলা নামক অঞ্চলটি স্বয়ত্তশাসিত সার্বভৌম রাষ্ট্র না হয়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ একটি সামান্য প্রদেশ – মাত্রে পরিণত হবে। কেননা 'রাষ্ট্রসমূহ' কথাটিকে শুধুমাত্র 'রাষ্ট্র' দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে বাংলারই (পশ্চিমবাংলার) একজন নেতাকে তার উথাপক বানানো হয়। কাজেই ইতিহাসের পরীক্ষায় শেরেবাংলা ও আবুল হাশিম উত্তীর্ণ হলেও সোহরওয়ার্দী উত্তীর্ণ হতে পারেননি। বাঙালীর নেতার বুঝা উচিত ছিল ১৯৪০ সনে লাহোর প্রস্তাবে গৃহীত হওয়ার প্রায় ৬ বছর পর তার সংশোধনীর কি প্রয়োজন ?

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দিল্লী প্রস্তাব এর উথাপক জনাব সোহরাওয়ার্দী দেশ বিভাগের ঠিক পূর্ব মূহুর্তে স্বয়ং জিন্নাহর অনুমতি নিয়েই স্বাধীন, সার্বভৌম, বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উথাপন করতে পেরেছিলেন। তখনই বাংলার সচেতন হিন্দুরা সংশয় প্রকাশ করতে শুরু করেন, সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন অবিভক্ত বাংলার কথা বলে সুকৌশলে তাদেরকে পাকিস্তান নামক ইসলামী প্রজতন্ত্রের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করতে চাচ্ছেন। কারণ দিল্লী প্রস্তাবের সাথে তারই প্রস্তাবিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র মোটেও সংগতিশীল ছিল না। একই ব্যক্তি যিনি দিল্লী প্রস্তাবের উথাপক (ও সমর্থক) তিনি কি করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্রের প্রস্তাব কি হতে পারেন ? আসলে সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন বাঙালী জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছিলেন এমন নির্ভরশীল কোন তথ্য ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি অবিভক্ত বাংলা অবশ্যই চাইতেন। তবে পাকিস্তানী কাঠামোর ভেতরে, পৃথক জাতিসত্ত্বা হিসাবে নয়। সোহরাওয়ার্দীর এই স্ববিরোধিতার জন্যই হিন্দু বাঙালীরা অবিভক্ত বাংলায় থাকার ব্যাপারে আগ্রহী হয়নি – তাদের সংশয় বা দ্বিধা সম্পূর্ণ অমূলক ছিল একথা জোর করে বলা যায় না।

দিল্লী প্রস্তাব দ্বারা লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আবুল হাশিম ইতিহাসে সবচেয়ে সৎ ও বলিষ্ঠ ভুমিকা পালন করেছিলেন। তার এবং শরৎ বসুর রাজনৈতিক আচরণ আগাগোড়াই সংগতিশীল, স্থিতিশীল এবং অপরিবর্তনীয় ছিল।

শেরে বাংলা যিনি লাহোর প্রস্তাবের রচয়িতা ও উথাপক ছিলেন (১৯৪০ সনে) তিনি ১৯৫৪ সনের নির্বাচনে জয় লাভ করেই কলিকাতা গিয়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর সম্বর্ধনার মুখে

আবেগতাড়িত হয়ে হঠাৎ বলে ফেললেন – "আমি পাকিস্তান হিন্দুস্তান বুঝি না, আমি বুঝি বাংলাদেশ' ?" এ কথাটি তার নিকট – অতীতের ভূমিকার সাথে মোটেই সংগতিশীল ছিল না, যদিও যে কোন খাঁটি বাঙালী নেতার বক্তব্য তা–ই হওয়া উচিত। অত্যন্ত গোপনে সুকৌশলে বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করতে পারতেন শেরেবাংলা। একথাটা সত্য হলেও প্রকাশ্যভাবে ভিন্ন দেশে গিয়ে বলা উনার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এর ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে ছিটকে পড়লেন। এটা কি উনার জন্য মঙ্গলজনক ছিল ? ১৯৪০ সনেই তার বুঝা উচিত ছিল "বাঙালী জাতির জন্য পাকিস্তান–হিন্দুস্তান তত্ত্ব আসলে মিথ্যা; সত্য হলো "বাংলাদেশ তত্ত্ব" অর্থাৎ "পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন বাংলাদেশ"। লাহোর প্রস্তাব না করে "ঢাকা প্রস্তাব" রচনা করা উচিৎ ছিল তার। যাহোক, রাজনীতি যখনই আবেগ সর্বস্ব বা ধর্মনির্ভর হয়ে উঠে তখনই নেতারা ভুল সিদ্ধান্ত নেন এবং সাধারণ মানুষকেও ভুল পথে পরিচালিত করেন। অনেক বড় মাপের নেতাও নিজ ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন। শেরে বাংলা প্রজাপার্টির নেতা হয়েও শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ করলেন। একথা বুঝা উচিত ছিল, সারা ভারতবর্ষের জন্য "বহুজাতিতত্ত্ব" কিন্তু বাংলাদেশের জন্য "একজাতিতত্ত্ব" প্রযোজ্য।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লাহোর প্রস্তাব অপরিবর্তিত থাকলে পশ্চিমবাংলার হিন্দু বাঙালীরা নিরাপত্তার অভাব অনুভব করতো না এবং খুব সম্ভবতঃ বঙ্গবিভাগের পক্ষে মত দিত না (১৯৪৭ এর ২০শে জুন তারিখে) – যদি না এক বছর আগে ১৯৪৬ সনে দিল্লী প্রস্তাব দ্বারা একাধিক স্বায়ত্তশাসিত "রাষ্ট্রসমূহের" পরিবর্তে একটিমাত্র মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ "রাষ্ট্র" – কাঠামো গঠনের প্রস্তাব করা হতো। কাজেই দেখা যাচ্ছে দিল্লী প্রস্তাবই মূলতঃ পরোক্ষভাবে এক বছর পর বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবের জন্ম দেয়। কারণ এক হাজার মাইলের বেশি দূরত্বে অবস্থিত একটি ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্র দ্বারা শাসিত হতে যাচ্ছে এমন একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ এর বাসিন্দা হওয়ার ব্যাপারে হিন্দু বাঙালীদের মধ্যে তেমন উৎসাহ বা প্রেরণা ছিল না। তা থাকা স্বাভাবিকও ছিলো না। করণ ঐ ভূখন্ড না হবে স্বায়ত্ব শাসিত, না হবে সার্বভৌম কোন দেশ। লাহোর প্রস্তাব ঠিক থাকলে ভারতের পূর্বাঞ্চলে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিকশিত হতো – যা হতো অবিভক্ত সার্বভৌম স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র, "পূর্ববাংলা" নামক প্রদেশ মাত্র নয়। ঐ ধরনের স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রে যোগদানের ব্যাপারে হিন্দু বাঙালীদের বেশিরভাগই মত দিত। কারণ বঙ্গবিভাগ একটি বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক ঘটনা ছিল – যা একান্ত নিরূপায় হয়েই পশ্চিমবাংলার হিন্দু বাঙালীরা সমর্পন করেছিল। ইতিহাস এর জটিল ঘটনা প্রবাহ এক অপ্রতিরোধ্য বন্যার মত তাদেরকে ঐ সিদ্ধান্তের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় – যার জন্য শুধু কংগ্রেসই দায়ী ছিল, একথা বলা যায় না লীগ ও অনেকাংশে দায়ী ছিল। সব ধরনের আবেগ এবং পক্ষপাতকে ঝেড়ে ফেলে ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করতে হবে। তাহলেই কেবল আবহমানকালের বাঙালী আত্মবিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবে।

নিজের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সত্যকে আবিষ্কার করতে পারলেই বাঙালীরা সফল হবে তাদের সাধনার চরম শিখরে পৌছতে – একথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। পশ্চিমবাংলার হিন্দুরা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে, অবাঙালীদের দ্বারাই তারা শাসিত হবে চিরকাল – এটা তাদের নিয়তি। অবাঙালী মুসলমানদের দ্বারা শাসিত হওয়ার চেয়ে অবাঙালী হিন্দুর দ্বারা শাসিত হওয়াই বাঙালী হিন্দুদের কাছে তখন বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক সত্য তারা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় ঐ সময়। আর তা'হলো পাকিস্তানের অবাঙালী জনসংখ্যার তুলনায় অবিভক্ত বাংলার বাঙালী মুসলমান–হিন্দুর মিলিত জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ থাকতো – যার ফলে বাংলার লোকেরাই উল্টা পাকিস্তান শাসন করতো ও প্রধান্য বিস্তার করতো অবাঙালীদের উপর। পক্ষান্তরে হিন্দুস্তানের অবাঙালী জনসংখ্যার তুলনায় বর্তমান পশ্চিমবাংলার বাঙালীরা অতি নগণ্য – প্রায় আট ভাগের এক ভাগ মাত্র। পাকিস্তানী অবাঙালীরা সমগ্র বাঙালী জাতির তুলনায় অর্ধেকের চেয়েও কম হতো। তখন তারাই উল্টা মুক্তির আন্দোলন শুরু করে দিতো। আর পাকিস্তান থেকে হয়তো আমরা ১৯৬১ সনেই আলাদা হয়ে এক বিরাট মহান বাঙালী জাতি ও রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বের বুকে মাতা তুলে দাঁড়াতে পারতাম। এক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দুরা (এম, এল, এ,'রা) আত্মঘাতী ভুল করেছিল – একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

১৯৪৭ সনে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মত দিয়ে এবং বিশাল অবাঙালী হিন্দুস্তানের সাথে যোগ দিয়ে পশ্চিম বঙ্গের বাঙালীরা নিজেদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে সত্য কিন্তু তারা তখন পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের জানমালের নিরাপত্তার কথা মোটেও ভাবেনি। এক হাজার মাইল দূরের একটি দেশের সঙ্গে শুধু ধর্মীয় আবেগে যোগ দিতে গিয়ে মুসলমান বাঙালীরা একই ভুল করেছিল ১৯৪৭ এ। তখনকার আবেগ তাদের দৃষ্টিশক্তিকে এতোটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, তারা যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পুরোপুরি বিসর্জন দিতে যাচ্ছে একথা তারা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল। তারা শিশুসুলভ আশংকায় ভেবেছিলেন নোয়াখালীর মত দাঙ্গা বোধ হয় রোজই ঘটবে যুক্ত বাংলার প্রতি জেলায়, প্রতি শহরে, প্রতি গ্রামে। এ ধারণা যে সবই ভুল তা পূর্ববঙ্গের আমলে, পূর্ব পাকিস্তান আমলে এবং বাংলাদেশ আমলে প্রমানিত হয়েছে কাজেই দেখা যাচ্ছে, ভুল আশংকার বশবর্তী হয়ে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মত দিয়েছিল। ওটা ছিল আত্মঘাতী ভুল। কাজেই ঐ ভুল শোধরানো দরকার। ব্যক্তির ভুলকে সহজে শোধরানো যায় কিন্তু একটি জাতির ভুলকে সংশোধন করতে সময়, সাধনা ও সঠিক নেতৃত্বের প্রয়োজন। সেই সঠিক নেতৃত্ব এখন পশ্চিমবাংলায় নেই – এমনকি বাংলাদেশেও বিরল। এর একটি পথ খোলা আছে। প্রথমে গোটা বঙ্গবলয়ে মানসিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনতে হবে। দ্বিতীয়তঃ জাতিসংঘ বা বিশ্বসংস্থাকে বুঝাতে হবে আমরা প্রাচীন বাংলাকে ফিরে পেতে চাই অর্থাৎ "বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র" গঠনের মধ্যমে পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা, আসাম, ইত্যাদি নিয়ে এমন একটি কনফেডারেশন গঠন করতে চাই – যা ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে সম্পুর্ণ আলাদা মিত্র রাষ্ট্রপুঞ্জ হিসাবে থাকবে 'বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র' নামে। এই কনফেডারেশনকে সঙ্গত কারণেই দিল্লী বিরোধী এবং অবাঙালী প্রভাবমুক্ত হতে হবে।

বাংলা কনফেডারেশন গঠনের ব্যাপারে বিশ্বজনমতকে আমাদের অনুকূলে আনার জন্য চীন, রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, জার্মানী, সউদী আরব, ইরান প্রভৃতি শক্তিশালী দেশের সমর্থন, সাহায্য ও সহযোগিতা চাইতে হবে। ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে অবশ্যই বিশ্বজনমত আমাদের পক্ষে যাবে। গত এক যুগের মধ্যে কোরিয়া এবং বাংলা ছাড়া সকল দ্বিখন্ডিত জাতি এক হয়ে গেছে – যেমন ইয়েমেন, ভিয়েতনাম ও জার্মানী। বার্লিন প্রাচীর উঠে গেছে – কাজেই বাংলার প্রাচীরও উঠবে একদিন। এই বিশ্বাস মনে রেখে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে।

একসময় রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে লিখেছিলেন "বাংলার দেহ এক কিন্তু অন্তর দুইটা"। আজ প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এখন বরং বলা যায় বাংলার অন্তর এক কিন্তু দেহ দুইটা।" কারণ হিন্দি কালচারের জোয়ারে আর হিন্দুস্তানী শাসন–শোষণের শিকার হয়ে এখন পশ্চিমবাংলার মানুষও বুঝতে পারছে বাংলার অন্তর এক হওয়া দরকার প্রথমে। অন্তরের মিল হলে দেহ মিলনের পথে কোন বাধা থাকে না। নর–নারীর প্রেম সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। পশ্চিম বাংলা, বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, আসাম, আরাকান এই সবগুলো অঞ্চলের মানুষের অন্তরকে একসূত্রে গাঁথতে হবে – এক মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে সবাইকে। উড়িষ্যা বিহারের বঙ্গভাষীরাও আমাদের সাথে রক্তের বাঁধনে বাঁধা। সারাবিশ্বে পাঁচটি দ্বিখন্ডিত জাতি ছিল – যেমন (১) জার্মানী, (২) ভিয়েতনাম (৩) ইয়েমেন (৪) কোরিয়া (৫) বাংলাদেশ। এরমধ্যে প্রথম তিনটি ইতিমধ্যেই একত্রিত হয়ে গেছে। বাকি আছে শেষ দুইটি – কোরিয়া এবং বাংলা।

মূলতঃ কংগ্রেস হাই কম্যান্ডের বিরোধিতার কারণেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্রের প্রস্তাব সফল হয়নি – জিন্নাহ প্রকাশ্যে কখনও এর বিরোধিতা করেননি। তবে তার পদক্ষেপ পরোক্ষভাবে বঙ্গবিভাগকে অনিবার্য করে তুলেছিল। হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস কি করে বাংলা বিভাগকে একটি ইস্যুতে পরিণত করে তা বুঝাবার জন্য আমি জনাব সিরাজউদ্দিন হোসেনের "ইতিহাস কথা কও বই থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"দপর্ণে এক নজরে" শিরোনামে তিনি লিখেছেন – "দিল্লী প্রস্তাব গৃহীত হবার প্রায় এক বছর পর বাংলার রাজনীতিতে এক নয়া বিতর্কের সূত্রপাত হয়। হিন্দু মহাসভা নেতা ডঃ শ্যামা প্রসাদ মূখার্জী অবিভক্ত বাংলার শেষ গভর্ণর ফ্রেডারিক বারোজের সাথে সাক্ষাৎ করার পর ১৯৪৭ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে দাবী করেন যে, ভারত বিভাগ করা হলে বাংলাকেও বিভাগ করতে হবে, কারণ বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিন্দু মহাসভার এই দাবীর প্রতি প্যাটেলের নেতৃত্বে কংগ্রেসের অবাঙালী কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। কংগ্রেস হাইকম্যান্ড, মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীকে নস্যাৎ করার কিংবা অন্ততঃ বিকলাঙ্গ করার ধন্বন্তরী হিসাবে, হিন্দু মহাসভার এই দাবীকে লুফে নয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস প্রধান সৌরীন্দ্র মোহন, ঘোষ, কিরণ শঙ্কর রায়,

শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ বাংলার শীর্ষস্থানীয় হিন্দু নেতারা কংগ্রেসের অবঙালী কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর এই হীন চক্রান্তের আসল মতলব বুঝতে পেরে কালক্ষেপ না করে বাংলার মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে বাংলার ভবিষ্যত রূপ কাঠামোর প্রশ্নে আলাপ আলোচনা শুরু করেন। বাংলার লীগ নেতৃত্ব অবশ্য বঙ্গভঙ্গের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ১৯৪৭ এর মাঝামাঝি সময়ে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট আচার্য কৃপালনী বাংলা বিভাগের সমর্থনে বিবৃতি দেওয়ার ফলে বঙ্গভঙ্গের দাবীটি রীতিমত একটি প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়" ("ইতিহাস কথা কও" পৃঃ- ১০-১১)।

দেখা যাচ্ছে, ক্রমানুসারে ডঃ শ্যামা প্রসাদ, প্যাটেল আর কৃপালনী বঙ্গভঙ্গকে অনিবার্য করে তুলেন। ডঃ শ্যামা প্রসাদ নিজে বাঙালী হয় বঙ্গভঙ্গের দাবী তুলেছিলেন বলেই প্যাটেল আর কৃপালনী এ কাজে মহা উৎসাহে ঝাপিয়েপড়েন। কাজেই দেখা যাচ্ছে আজকের পশ্চিমবাংলার করুন অবস্থার জন্য এবং পূর্ববাংলার তথা আজকের বাংলাদেশের বাঙালী হিন্দুদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার জন্য ডঃ শ্যামা প্রসাদ ও তার হিন্দু মহাসভা মূলতঃ দায়ী। তারপরেই দায়ী অবাঙালী কংগ্রেস নেতা নেহেরু-প্র্যাটেল-কৃপালনী চক্র। হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্যে বাংলাকে দুই টুকরো করার মহা মওকা পেয়ে গেলেন তারা।

ইংরেজের ইতিহাস হলো পরশাসন, পরশোষণ পরপীড়ন, পরহরণ, পরবিনাশ, পরলূণ্ঠন আর পর বঞ্চনার; বাংলার ইতিহাস ঠিক তারই উল্টো। ইংরেজ পরঘাতী আর বাঙালী আত্মঘাতী। বাংলার সম্পদ চিরকাল অবাঙালী বিদেশীরা লুট করে নিয়ে গেছে - ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ মোগল তুর্কী, পাঠান, মগ, ফিরিঙ্গী, মারাঠী, পাঞ্জাবী মাড়োয়ারী - কেউ বাদ নেই। এর একটাই করণ। জাতি হিসাবে আমরা সজাগ নই - কোনদিন সজাগ ছিলাম না। তবে ভবিষ্যতে অবশ্যই সজাগ হতে হবে আমাদেরকে। আমরা যদি সতর্ক ও সজাগ হতে পারি তবে আমাদের সামনে শুধু মহাজাগরনই নয় - এক মহাবিজয় অপেক্ষা করছে। সুদীর্ঘ প্রায় ছয়শত বছরের মুসলমান সুলতান বা নবাবদের শাসন বাঙালীর কাছে পরশাসন মনে হয়নি কারণ শাসকরাও এদেশের মানুষের সাথে এক হয়ে মিশে গিয়েছিলেন। বাংলার সম্পদ তারা বাংলাতেই ভোগ করেছেন। বাংলার বাইরে কোথাও নিয়ে যাননি - এমনকি দিল্লীতেও নিয়ে যানণি - বরং তারা দিল্লীর অধীনতা মানতে অস্বীকার করেছেন বারবার। আর ইংরেজ শাসকরা বাংলার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে লন্ডনে, মানচেষ্টারে ডান্ডিতে; বৃটিশ সাম্রাজ্যের ধনভান্ডার গড়ে তুলেছেন বাংলার রাজস্ব দিয়ে। ১৯৫৭ সনে ইংরেজের পরাধীন হওয়ার সময় বাংলাছিল অখন্ড কিন্তু ১৯৪৭ সনে ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় বাংলা হলো খন্ডিত - এটাই হচ্ছে ট্রাজেডি। বাংলার ঐক্য ও অখন্ডতার নিরিখে বিচার করলে বলতে হয় স্বাধীনতার যুগের চেয়ে পরাধীনতার যুগে বাংলার ইতিহাস ছিল উজ্জ্বলতর - খন্ডতা ছিল না তখন। ধর্মের নেশায় মশগুল বাঙালীরা চল্লিশের দশকে বুঝতে পারেনি যে স্বাধীনতার নামে তারা শুধু প্রভু বদল করেছে এবং প্রভুর সংখ্যা

দ্বিগুণ হয়েছে। ইংরেজের বদলে হিন্দুস্তানী আর পাকিস্তানী প্রভু বেছে নিয়েছিল তারা। বরং এক প্রভুর স্থানে দুই প্রভু হলো অর্থাৎ বিড়ম্বনা দ্বিগুণ হলো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে মুক্ত হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা পশ্চিমা অবাঙালীদের অধীনে চলে গেল ১৯৪৭ এ। কাজেই ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের জন্য স্বাধীনতা পাওয়া গেলেও বাঙালীস্তানের জন্য কোন স্বাধীনতা আসেনি। পূর্ববাংলা পাঞ্জাবীদের অধীনে আর পশ্চিমবাংলার বাঙালীরা হিন্দুস্তানীদের অধীনে চলে গেল। এক বাংলার জায়গায় দুই বাংলা হলো। এক বেদনার জায়াগায় দুই বেদনা জন্ম নিল। এক প্রভুর জায়গায় দুই প্রভু হলো।

ইদানিং আসামের ৭ বোনের মধ্যে ৪ বোনই প্রায় স্বাধীনতার পতাকা তুলতে চাচ্ছে। ত্রিপুরা আর পশ্চিমবঙ্গেও মুক্তির পতাকা উঠবে। আজ কাশ্মীর জ্বলছে। জ্বলছে পাঞ্জাব। ভারতের উত্তর-পূর্বদিকের ক্ষুদ্র প্রতিবেশীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে - যেমন নেপাল -ভুটান-বাংলাদেশ। পূর্ব-ভারত তথা আসাম বর্তমানে একটি অগ্নিবলয় বা অগ্নিগর্ভ। ৪ লক্ষ হিন্দুস্তানী সৈন্য ওখানকার বিদ্রোহ দমন করার জন্য অবস্থান করছে। ১৯৪৭ এর দেশবিভাগের পর মিঃ জিন্নাহ মাত্র ৬ মাসের জন্য কলিকাতাকে মুক্ত বন্দর বা ফ্রিপোর্ট হিসাবে রাখার অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন; উত্তরে নেহেরু এবং গোখলে বলেছিলেন, ৬ ঘন্টার জন্যও নয়। এখন ভারতকে যদি চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে দিতে হয় তবে নেপাল এবং চীনকেও এ অধিকার দিতে হবে। হিন্দুস্তান আমাদের ৫০টি নদীর স্রোতবন্ধ করেছে। প্রকৃতির প্রবাহকে তারা রোধ করতে চায় অপ্রাকৃতিক উপায়ে। বাংলাদেশ কিছুতেই একটি ভূমি পরিবেষ্টিত রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে না। আসামের ৭ রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদ ধ্বংসের জন্য ভারতীয় কেন্দ্রীয় শাসকরা এবং জেনারেলরা যে চেস্টা করছে তা ব্যর্থ হবে। উল্টা অচিরেই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে ত্রিপুরা আর পশ্চিমবাংলায়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ এই অধ্যায় বাংলার ক্ষয় পাওয়ার দশক। ১৯৭১ থেকে ১৯৯৭ এই অধ্যায় বাংলার জয় সূচনা করেছে।

পাঁচ লক্ষ লোক অধ্যুষিত ডেনমার্কের মত রাষ্ট্রকনিকাও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ইউরোপের বুকে - তাহলে কোটি কোটি লোকের দেশ বাংলা কেন এশিয়া তথা বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না ? অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের তুলনায় বাংলাদেশে ৮ গুণ বেশি লোক বাস করে। সিঙ্গাপুর দেশটি ঢাকা মহানগরীর চেয়ে ছোট। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়ার পাশে সেও তো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমাদের উচিত ভারত উৎসবের চেয়ে বঙ্গ উৎসবের প্রতি বেশি উৎসাহী হওয়া। আধুনিক বিশ্বে "বঙ্গবলয়" এক বৈচিত্র্যময় সুললিত সংস্কৃতির লীলা নিকেতন হিসেবে বিকাশ লাভ করবে - যদি আমরা পশ্চিম বাংলাদেশ, ত্রিপুরা ও আসাম নিয়ে একটি কণফেডারেশন গঠন করতে পারি, যা হবে 'বাংলা কনফেডারেশন'। তবে রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক কনফেডারেশন এর পূর্বে যা সবেচেয়ে বেশি দরকার তা, হলো সাংস্কৃতিক মিত্ররাজ্য সৃষ্টি করা। 'কালচারাল কনফেডারেশন অব বেঙ্গল এন্ড আসাম' বা ভাষাভিত্তিক কনফেডারেশন আমাদের মধ্যে

পলিটিক্যাল কনফেডারেশন গঠনের প্রথম সোপান তৈরী করবে। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক মৈত্রীবন্ধনের সেই সোপান বেয়ে আমরা বঙ্গবাদের উচ্চতম সোপানে পৌছি যাবো অর্থাৎ "পূর্ণাঙ্গ বাংলাদেশ" গঠনে সক্ষম হবো। আমাদের কনফেডারেশনে একটি উদার শর্ত থাকবে – মৈত্রীবন্ধ যে কোন রাজ্য ইচ্ছা করলেই যে কোন সময়ে গণতান্ত্রিক মত প্রকাশের ভিত্তিতে পৃথক, স্বাধীন হয়ে যেতে পারবে। আসাম যদি চায় সে যে কোন সময় আলাদা অস্তিত্ব নিয়ে থাকতে পারবে তবে আসাম যেহেতু ভূমিবদ্ধ অঞ্চল বা স্থলবেষ্ঠিত রাজ্য, তাকে সবসময় বাংলাদেশের সামুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রামের ভেতর দিয়েই বহির্বিশ্বে যাওয়ার পথ খুঁজতে হবে এবং সে কারণে তার জন্য হিন্দুস্তানের সাহায্যের চাইতে বাংলাদেশের সাহায্যের প্রয়োজন বেশি হবে। নিজের স্বার্থেই আসাম, ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক রাখার জন্য বেশি আগ্রহী ও সচেষ্ট হবে। আসামের জন্য কলিকাতা বন্দর বা মদ্রাজ বন্দর অনেক দূরবর্তী কিন্তু চট্রগ্রাম বন্দর হচ্ছে ঘরের কাছের বিশ্বতোরণ – যা বহির্বিশ্বের সঙ্গে তার যোগাযোগকে করবে সহজতর। আসামের স্বাধীনতাকামী মানুষেরা সেই সোনালী দুয়ারের সন্ধান করেছে। মুসলিম বাংলা বা হিন্দু বাংলার পরিবর্তে ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাই বেশি কাম্য। প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছরের মুসলিম শাসনের সময় এই মিলিত বাংলা টিকেইছিল।

'স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন' সমর্থনযোগ্য নয় কারণ এর ভিত্তি হচ্ছে স্বাধীন হিন্দু বাংলা গঠন।

একটি বিষয় আমি এখানে উল্লেখ না করে পারছি না আর তাহলো ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নের এক পর্যায়ে বাঙালী হিন্দুদের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তর বঙ্গে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবীঃ–

"১১ই এপ্রিল, ১৯৪৭, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে বাংলার ১১ জন হিন্দু প্রতিনিধি ডাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের নিকট পেশকৃত এক স্মারকলিপিতে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ভূখন্ডের আওতায় পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে একটি স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ গঠনের দাবী করেন।" (ইতিহাস কথা কও" – পৃঃ – ১৭) ঐ স্মারকলিপির বিষয়বস্তুর সাথে সাম্প্রতিককালের "স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন' এর একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আমি বলতে চাই – বঙ্গভূমি আন্দোলন করার আগে উদ্যোক্তাদের উচিত ছিল প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা–আসাম অঞ্চলকে একটি কনফেডারেশন গঠনের আহবান জানানো। কিন্তু চালাকি করে ১৯৪৭ সনের ১১ই এপ্রিলের দাবীরই পুনরাবৃত্তি হিসাবে 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' আন্দোলন দাবী খাড়া করলে তা মোটেও কোন আবেদন সৃষ্টি করবে না। (স্বয়ং পশ্চিমবাংলাতেই)- বাংলাদেশের তো প্রশ্নই উঠে না। বঙ্গরাজ্য কোনদিন অঙ্গরাজ্য হবে না ভারতের। কারণ, ভারতীয় ইউনিয়নের অর্ন্তভূক্ত হিসাবে নতুন কোন সীমানা নিয়ে বঙ্গরাজ্য গঠনের কোন যুক্তি নেই। কেউতা গ্রহণও করবে না। কাজেই ডঃ পার্থ সারথিকে ইতিহাসের বাস্তবতা অনুধাবন করতে হবে – এমন প্রোগ্রাম দিতে হবে যা গোটা বাংলা–আসাম অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ সকল

সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। শুধু হিন্দু বাঙালীর কাছে গ্রহণযোগ্য কোন সমাধান এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অকার্যকর হবে। বৃহত্তর বাংলা–আসাম একটি সুবৃহৎ স্বতন্ত্র মহাজাতি, এ তত্ত্ব খাড়া করতে হলে ভারতকে এমন একটি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখাতে হবে বিশ্বের চোখে যা তাকে "দেশ" নয় বরং একট 'মহাদেশ' রূপে প্রতিপন্ন করবে। "ভারত একটি মহাদেশ" এটা যদি একটা তত্ত্ব হয় তবে আর একটি এ তত্ত্বও ভারতকে মানতে হবে আর তাহলো বাঙালী জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব বা বাঙালীর একজাতি তত্ত্ব বা ওয়ান নেশন থিওরী যার অস্তিত্ব বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে পশ্চিমে দ্বারভাঙ্গা পর্যন্ত এবং পূর্বে আরাকান এর রাজধানী আকিয়াব পর্যন্ত, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এটাই আসলে টলেমির 'সোনার বাংলা। অনেকগুলো প্রদেশ নিয়ে হয় দেশ। অনেকগুলো দেশ নিয়ে হয় মহাদেশ – উপমহাদেশ নয়। এশিয়া ছাড়া বিশ্বের সকল মহাদেশ একাধিক দেশের সমষ্টি মাত্র। অনেক দেশ আর ভারত নামক একটি উপমহাদেশ মিলে হয়েছে এশিয়া; এটা ব্যতিক্রম। এখন আমি ভারত যে 'একজাতি একদেশ' নয় বরং 'বহুজাতি – বহুদেশ' ভিত্তিক এক বিশাল মহাদেশ, তা প্রমাণ করবো। পৃথিবীর ৭টি মহাদেশের মধ্যে একমাত্র এশিয়া ছাড়া আর কোন মহাদেশের ভেতর 'উপমহাদেশ' নামে কোন ভূখন্ডনেই, ব্যতিক্রম শুধু এশিয়া কারণ ইংরেজরা ইন্ডিয়াকে দেশও বলেনি আবার মহাদেশও বলেনি। দেশ বলাতো হাস্যকর। আর মহাদেশ বললে একে কলোনী করা অসঙ্গত হবে। যে ভূখন্ডটাকে সে আস্তে আস্তে ব্রিটিশ কলোনী হিসাবে গ্রাস করবে সে ভূখন্ডটিকে মূল বৃটেন যুক্তরাজ্য থেকে বেশি মর্যাদাশীল করাটা তাদের কাছে বাঞ্ছনীয় ছিল না। তাই তারা এটাকে ইন্ডিয়া উপমহাদেশ নাম দেয়।

কতগুলো দেশ মিলে একটি মহাদেশ হয়। অনেকগুলো দেশ নিয়ে আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া মহাদেশ গঠিত হয়েছে। ঐ হিসাবে ভারতবর্ষও মহাদেশ হতে পারতো এবং মহাদেশটির জনসংখ্যা ১০০ কোটি হতো। আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ার কোন অংশকেই উপমহাদেশ বলা হয়নি অথচ এশিয়ার অংশ ভারতকে উপমহাদেশ বলা হলো। পৃথিবীতে উপমহাদেশ মাত্র একটি অথচ মহাদেশ সাতটি। এই অসঙ্গতি ইংরেজ এর ইচ্ছাকৃত একটি ভুল নামকরণ। এই ক্ষুদ্রায়িত নামকরণের ফলেই ভারতবর্ষের ভেতর এতো জাতিগত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা হলো 'একজাতি–একদেশ' আর ভারত হলো 'বহুজাতি – বহুদেশ'। একটা কথা মনে রাখতে হবে; দ্বিখন্ডিত হয়েছিল বঙ্গদেহ, বঙ্গাত্মা নয়। আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, সুদূর অতীতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হংকং যদি ১৫০ বছর পর পুনরায় মাতৃচীনের কাছে ফেরত আসতে পারে তাহলে বাংলার হারিয়ে যাওয়া কলিকাতা নগরী (৫০ বছর গত হয়ে যাবার পর) কেন মাতৃবাংলার কাছে ফেরত আসবে না ?

মুসলিম লীগ গোটা বাংলাদেশেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। দিল্লী প্রস্তাবে সোহরাওয়ার্দী ও জিন্নাহর ভূমিকা সেই চাওয়াকেই রূপ দিতে চেয়েছিল আর হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেস মিলে গোটা বাংলাদেশেই হিন্দুস্তান প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু গোটা

বাংলাদেশে মুসলিম লীগ বা কংগ্রেস কেউই কখনও বাঙালীস্তান প্রতিষ্ঠা করতে রাজি ছিল না। গোটা বাংলা অখন্ড অবস্থায় যখন মুসলিম লীগ বা কংগ্রেস কোনটিরই নেতৃত্বাধীনে এলো না তখন নেহাৎ নিরূপায় হয়েই উভয়ে একটা প্রচ্ছন্ন সমঝোতার মধ্যদিয়ে বঙ্গ বিভাগকে মেনে নিল যাতে এই দুইটি দলের নিজ নিজ মালিকানায় অন্ততঃ অর্ধেক বাংলা থাকে – বাস্তবে তাই থাকলো। দুইটি বাণিজ্যিক কোম্পানীর মত আচরণ করলো এই দুইটি প্রতিষ্ঠান। তাহলে দেখা যাচ্ছে ভারত থেকে পৃথক স্বাধীন, সার্বভৌম ও অখন্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার কোন নীতি–আদর্শ এই দুইটি সংগঠনের কারো মধ্যেই ছিল না। কংগ্রেস অখন্ড বাংলা চাইতো হিন্দুস্তানের একটি প্রদেশ হিসাবে আর মুসলিম লীগ অখন্ড বাংলা চাইতো পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে – যদিও প্রদেশটি এক হাজার মাইলেরও বেশি দূরত্বে অবস্থান করবে। বাস্তবে অখন্ড বাংলা হিন্দুস্তান বা পাকিস্তান কারো ভাগ্যেই যখন জুটলো না তখন পূর্ব খন্ড নিল পাকিস্তান আর পশ্চিম খন্ড নিল হিন্দুস্তান। বাংলা ব্রিটিশ যুগের মতই পরাধীন থেকে গেল ১৯৪৭ এর পরেও। ১৯৭১ এ পূর্বাংশ স্বাধীন হলেও পশ্চিমাংশ এখনও পরাধীন। হিন্দুস্তানী শাসনাধীনে আছে।

বাঙালী জাতীয়তাবাদ বা বাঙালীর স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব যদিও মুসলিম লীগ কিংবা কংগ্রেস কারোই লক্ষ্য ছিল না তবুও সমগ্র বাঙালী জাতি নেচেছিল মুসলিম লীগ আর কংগ্রেস এর কথাতেই। সত্যি কী বিচিত্র এই দেশ। আর কী বিচিত্র এই জাতি! আবুল হাশিম আর শরতবসুর মত বিশুদ্ধ বাঙালী জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল নেতারাও যথাক্রমে মুসলিম লীগ আর কংগ্রেসের প্রাদেশিক প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শূন্যতা একটি জাতির জন্য কত ভয়াবহ হতে পারে – এ অবস্থা থেকে তা সহজেই বুঝা যায়।

নিখিল বঙ্গবিত্তিক কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান না থাকার বিষয়টি আমাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার পরিচয় বহন করে। সারা ভারতবর্ষে তখন শুধু ইংরেজ তাড়ানোর ব্যাপারটাই মুখ্য বিষয় হয়ে উঠে। মহাদেশ তুল্য ভারতে মাত্র দুইটি বিশাল জাতিসত্ত্বা শুধু সাম্প্রদায়িকতার পরিচয়ে দ্বিখন্ডিত হয়েছিল – অর্থাৎ ভূখন্ডগতভাবে বাংলা ও পাঞ্জাবই শুধু দ্বিখন্ডিত হলো। অন্য কোন রাজ্য খন্ড বিখন্ড হলো না – এটা কি অপ্রাকৃতিক ও অস্বাভাবিক নয় ? এটাকি বাঙালী ও পাঞ্জাবীদের দুর্ভাগ্য ? না মানবসৃষ্ট এক মহাবিপর্যয়? মহা দুর্যোগ ? আমার প্রশ্ন, মোগল আমলের সমাপ্তিলগ্নে যে বাংলা ধনী, স্বাধীন ও অবিভক্ত ছিল সে বাংলা ব্রিটিশ আমলের সমাপ্তিলগ্নে গরীব পরাধীন আর বিভক্ত হলো কেন ? কোন এই মহান দেশ ও মহাজাতি হিন্দুস্তান আর পাকিস্তানের দাসত্ব মেনে নিল? ? এটার কারণ একটাই – সাময়িক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা – যা সৃষ্টি করেছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অবাঙালী নেতারা–নেহেরু প্যাটেল–জিন্নাহ–লিয়াকত চক্র।

তাছাড়া বঙ্গবিভাগ যে বেআইনী এবং অবৈধ হয়েছিল তার প্রমাণ, বাংলার আপামর জনগণ এর পক্ষে ভোট দেয়নি। ভোট দিয়েছিল শুধু হিন্দু বাঙালী এম–এল–এ– রা অর্থাৎ

গণপরিষদ সদস্যগণ – যাদের কোন আইনগত এখতিয়ার ছিল না ঐ ধরনের মৌলিক প্রশ্নে অর্থাৎ নিজ মাতৃভূমি বাংলাদেশকে দ্বিখন্ডিত করার পক্ষে রায় দেবার। কারণ ঐ উদ্দেশ্যে তাদেরকে নির্বাচিত করা হয়নি। তাদের এমন কোন ম্যান্ডেট ছিল না যার বলে তারা বাংলার এক অঞ্চলকে হিন্দুস্তানে যোগ দেবার ও অপর অঞ্চলকে পাকিস্তানে যোগদেয়ার পক্ষে মত দিতে পারে। বাংলার এম–এল–এ দের কোন আইনগত এখতিয়ার ছিল না বাংলাকে ভাগ করার। স্কটল্যান্ড ইংল্যান্ডের সাথে মিশেছে মাত্র ৩০০ বছর আগে। আর পশ্চিমবাংলা মূল ভুখন্ড বাংলাদেশের সাথে মিশে ছিল ৩০০০ বছর আগে থেকে। মাঝখানে মাত্র ৫০ বছরের বিচ্ছিন্নতা।

এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলো বৃটিশ সরকারের ১৯৪৭ সনের ৩রা জুনের পরিকল্পনা এবং সে পরিকল্পনাকে তাড়হুড়া করে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে কংগ্রেস ও লীগের মেনে নেয়া। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ১৫ই জুন অধিবেশনে ১৫৭–২৯ ভোটে বৃটিশ সরকারের পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়। ৩২ জন সদস্য গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান কোন পক্ষেই ভোট দেননি। উপস্থিত সদস্যের সংখ্যা ছিল ২১৮। প্রায় আট ঘন্টাব্যাপী তুমূল বিতর্কের পর প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিতর্ক প্রসূত উত্তেজনা আয়ত্বে আনার জন্য নেহেরু ও প্যাটেল খোলাখুলি একটি কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, কংগ্রেস কমিটির সামনে মাত্র দুইটি বিকল্প পথ খোলা আছে – (১) ভারতবর্ষকে ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিখন্ডিত করার ব্যাপারটি মেনে নেয়া। (২) ভারত বর্ষেকে বহুখন্ডিত করার ব্যাপারটি তথা ভারতবর্ষের বলকানাইজেশন মেনে নেয়া। নেহেরু প্যাটেল চক্রের অধৈর্য ও অস্থিরতা কমিটির সদস্যদেরকে খুব একটা সুস্থ চিন্তার অবকাশ দেয়নি। তারা ১নং ব্যাবস্থাটি মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের নিরিখে এবং 'বাংলা আসাম' অঞ্চলের স্বার্থে ২নং ব্যবস্থাটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য ছিল। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ২য় প্রস্তাবটিকেই সমর্থণ করেছিল এবং বাংলা বিভাগ ও পাঞ্জাব বিভাগকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ভারতবর্ষ সুদূর অতীতে কখনও একরাষ্ট্র ছিল না – শতধাবিচ্ছিন্ন বলকানাইজড অবস্থায়ই ছিল সবসময়। শুধু মোগল ও বৃটিশ আমলে বহিরাগতদের উদ্যোগে কৃত্রিমভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় ভারতবর্ষ নামক ভূখন্ডটি – কে না জানে যে, ভারতীয় বা হিন্দুস্তানী জাতীয়তা বৃটিশদেরই উদ্ভাবিত এক সংকর বা মিশ্রিত জাতীয়তা? বিশালতা ও বৈচিত্র্যে ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ। একদেশ এক জাতির ধারনাটি ভারতবর্ষের বেলায় প্রযোজ্য নয়। ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ না হয়ে যদি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও জাতীয়তার ভিত্তিতে ভাগ হতো তাহলে দুইভাগ না হয়ে কমপক্ষে ১০টি দেশ ও জাতির জন্ম হতো ভারতবর্ষের বুকে (বৃটিশ পরবর্তী যুগে) – এবং সেটা হওয়াই যুক্তিসঙ্গত, প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ছিল। তাহলে বাংলা–আসাম অঞ্চল ভারতবর্ষে সবচেয়ে বৃহত্তম জাতিসত্ত্বা হিসাবে বিকাশ লাভ করতো। যার ভাষা সারাবিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম। দুঃখের বিষয়–বাঙালী জাতি নিজেই জানে না সে কত বড়। কত বিরাট তার ভাষা, কত মহান তার সাহিত্য, কত উন্নত তার সংস্কৃতি ও সভ্যতা, কোথায় তার শিকড় ? সাধারণ মানুষ না জানলে আমার কোন দুঃখ ছিল না কিন্তু এই আত্মঘাতী জাতির মুখপাত্র বলে যারা গর্ব করেন সেই গুটি কতক প্রাণহীন

বুদ্ধিজীবীও জানেন না তাদের জাতি কত বড় ? তাদের ঐতিহ্য, ইতিহাস কত মহান ? কত মহিয়সী গরিয়সী এই বাংলা! আসন্ন একুশ শতকের নবজাগড়নের প্রেরণায় সমগ্র বাঙালী জাতি যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তবে সে ভারতবর্ষ কেন সারাবিশ্বকে কাঁপিয়ে দিতে পারবে। নেপোলিয়ন যেমন ঘুমন্ত চীনা জাতি সম্পর্কে একটি মন্তব্য করেছিলেন, আমি আজ ঘুমন্ত বাঙালী জাতি সম্পর্কে তেমনি একটি মন্তব্য করতে চাই – The Bengali Tiger is sleeping now, when it will awaken, it will shatter the World." নেপেলিয়ন চাইনিজ লায়নের কথা বলেছিলেন – আমি বলছি বেঙ্গলী টাইগারের কথা – যে রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে সারাবিশ্বে চেনে এক রাজকীয় প্রাণী হিসাবে। কি স্বার্থে কি কারণে কি নিগুঢ় রহস্যের জন্য নেহেরু–প্যাটেল চক্র কেবিনেট মিশন প্ল্যান মানতে চাননি তা বিশ্লেশণ করলে দেখা যাবে ঐ প্ল্যান বাস্তবায়িত হলে "বি" গ্রুপে "বাংলা–আসাম" অঞ্চল একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়ে শিল্প সমৃদ্ধ পশ্চিম বাংলাদেশ এবং তেল সমৃদ্ধ আসাম দিল্লীর হাত ছাড়া হয়ে যাবে; শুধু এই আশংকায় নেহেরু প্যাটেল চক্র ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানকে বানচাল করে দিয়েছিলেন। কারণ বর্তমান ভারতের পেট্রোল উৎপাদনের ৯০% ভাগ যায় আসাম থেকে যা অতীতে ছিল বাংলার সম্পদ কেননা সুরমা উপত্যাকা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল – ১৮৭৪ সনে "অসম" সুরমা উপত্যাকার নাম পাল্টিয়ে ইংরেজরা "আসাম" নামে একটি নতুন প্রদেশের জন্য দেয় সরকারী গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে – বাংলাকে আকারে ছোট করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য – যেমন করে ১৯৩৭ সনে বাংলার অবিচ্ছেদ্য ভূখন্ড আরাকানকে বার্মার হাতে তুলে দেয়া হয় (যখন বৃটিশ ভারত থেকে বার্মাকে আলাদা করা হয় – পৃথক একটি দেশ ও জাতি হিসাবে (১৯৩৭ সনে)। এর উদ্দেশ্যও ছিল বাংলা ও বাঙালীকে আকারে ছোট করা। আসাম কিংবা "অসম" বলতে বাংলার অসমতল উঁচুনীচু অঞ্চলকেই বুঝতো। উদ্দেশ্য – বাংলার ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সীমানা ছোট্ট করা "নেওয়ারী" প্রদেশ বাংলার কথা বললেও তা নেপালের সীমানা মধ্যেই থেকে যায়। নেপালী দাড়োয়ান, গুর্খা সৈন্য এবং বার্মিজ ভৃত্য, বার্মিজ দাড়োয়ান ইত্যাদি ইংরেজের সেবা করেছে চিরকাল বিশ্বস্ত সেবাদাসের মত – সেজন্য ইংরেজরা বার্মা ও নেপালের সীমানা সংকৃচিত করতে চায়নি পক্ষান্তরে বাংলার সীমানাকে করেছে সংকুচিত কারণ বাঙালীরা বিদ্রোহ করেছে, বিপ্লব করেছে, স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে সবার আগে, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দ্বারা। পাকিস্তানী ও হিন্দুস্তানীদের মত বৃটিশের মোসাহেবী করেনি বাঙালীরা। এই ঐতিহাসিক কারণে নিজের স্বার্থে বৃটিশরা এই মহানদেশকে খন্ড বিখন্ড করেছে – গ্রেট বাংলাকে গ্রেট ন্যাশন হিসাবে বিকশিত হতে দেয়নি, তাদের স্বদেশ গ্রেট বৃটেনের মত। যদিও বিগত দুই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে এই দেশ গ্রেট ছিল এবং এই জাতি গ্রেট ছিল – মাত্র তিন শতাব্দী আগেই গ্রেট বৃটেনের চেয়ে অনেক বেশি সম্পদশালী ও সমৃদ্ধশালী ছিল – চার শতাব্দী আগে সারাচিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও সস্তা পণ্যের দেশ ছিল এই সোনার বাংলা। ইংরেজরা যদি এহেন একটা মহাজাতিকে ও মহা সমৃদ্ধ দেশকে মাত্র দুই শতাব্দীর শাসন শোষণে গোরস্তানে পৌছে দিয়ে থাকে তবে এখন সময় এসেছে তার একটা হিসেব নিকেশ করার। ইংরেজ প্রভু তার উত্তরসূরী দুই প্রভুর হাতে

আমাদেরকে তুলে দিয়ে যায় – সেই দুই প্রভু হলো পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান। এক প্রভু পাকিস্তান এর হাত থেকে আমাদের জাতির বৃহত্তম অংশ মুক্ত হয়েছে। ক্ষুদ্রতর অংশটি এখনও রয়ে গেছে হিন্দুস্তানী দখলে। পূর্ণাঙ্গ বাঙালী জাতির বিকাশ শুধু তখনই সম্ভব হবে যখন দুই বাংলা এক হবে কিংবা কমপক্ষে মিত্ররাজ্য বা কনফেডারেশন গঠন করবে। এই দুইটি পথের যে কোন একটিকে বেছে না নিলে একুশ শতকের মহাজাগরণ যা আমাদের ভবিষ্যত নিয়তি হিসাবে সমাগত – তা সম্পূর্ণ সার্থক হবে না। পশ্চিম বাংলাদেশের অসহায় মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে বিশ্বের সকল শক্তির সাহায্য কামনা করা সঙ্গত হবে। ঘরের পাশে রয়েছে মহাচীন তারপরেই রয়েছে কোরিয়া, ভিয়েতনাম, জাপান, আছে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়, থাইল্যান্ড।

“Idea Govers the World” একথা যদি সত্য হয় তাহলে বাঙালী জাতি পরিচালিত হবে “বঙ্গবাদ” নামক মতবাদ এর দ্বারা – হিন্দুস্তানী রাজশক্তির দ্বারা নয়। বঙ্গবাদকে ইংরেজীতে “প্যান বেঙ্গলিজম” বলা সঠিক হবে। ‘প্যান জার্মানিজম’ যেমন করে মাত্র সাড়ে তিন বছরে জার্মান জাতিকে জাগিয়ে দিয়েছিল – তেমনি করে ঘুমন্ত বাঙালী জাতিকে জাগিয়ে দিবে ‘প্যান বেঙ্গলিজম’ বা “বঙ্গবাদ”। “বঙ্গবাদ” হচ্ছে বঙ্গীয় নাটকের প্রথম পর্ব আর “মহাবঙ্গবাদ” হচ্ছে তার শেষপর্ব – যে পর্বে মহাবঙ্গই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, “মহাবঙ্গবাদ” এর তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে।

মাত্র সেদিন অর্থাৎ ১৯৩৫ সনে বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী থেকে আলাদা করা হয়। তার দুই বছর পর ১৯৩৭ সনে আরাকান অঞ্চলকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বার্মার সাথে জুড়ে দেয়া হয়। ১৯৪০ সনে যে লাহোর প্রস্তাব ত্রিজাতিতত্ত্বের জন্ম দিয়েছিল তাকে ১৯৪৬ সনে দিল্লী প্রস্তাবের দ্বারা দ্বিজাতিতত্ত্বে রূপান্তরিত করা হয় অর্থাৎ শহীদ সোহরাওয়ার্দী উত্থাপিত দিল্লী প্রস্তাবের দ্বারা স্বায়ত্তশাসিত বাংলা – আসাম রাষ্ট্র গঠনের পরিবর্তে শুধুমাত্র পূর্ববাংলা নামক একটি প্রদেশ সৃষ্টি করা হয় যা পাকিস্তান নামক ইসলামী প্রজাতন্ত্রের মাত্র একটি প্রদেশ বলে বিবেচিত হয়। মিঃ জিন্নাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দীকে এই প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য যাতে করে বাংলা–আসাম অঞ্চল সার্বভৌম ও স্বাধীন একটি রাষ্ট্রে পরিণত না হয়ে এর খন্ডাংশ মাত্র পাকিস্তানের অধীন থাকে, এক হাজার মাইলের বেশি দূরত্বে অবস্থান করা সত্ত্বেও। যা হতে পারতো ভারতবর্ষীয় ভূখন্ডে পূর্বাঞ্চলীয় এক বিরাট স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র (লাহোর প্রস্তাবের রূপরেখা অনুসারে) তাহলো মাত্র একটি ক্ষুদ্র পরাধীন প্রদেশ– পূর্ববঙ্গ। লাহোর প্রস্তাব তিন জাতি তত্ত্বের জন্ম দিয়েছিল কিন্তু দিল্লী প্রস্তাব দুই জাতি তত্ত্বের জন্ম দেয়। কাজেই দিল্লী প্রস্তাবের দ্বারা লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনের ফলেই বাংলার দুর্ভাগ্য রচিত হয় – যে দুর্ভাগ্য আমাদেরকে উপহার দেয় এক খন্ডিত বাংলা তাও পাকিস্তানের অধীনে। এটা স্পষ্ট যে, সোহরাওয়ার্দী মিঃ জিন্নাহর দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয়েছিলেন, – পক্ষান্তরে ফজলুল হক মিঃ জিন্নাহর দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হতে রাজি হননি। বরং দৃঢ়তার সাথে দ্বিমত পেষণ করতেন। আজ ত্রিজাতিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ঐ

সত্যকেই তুলে ধরেছে – যা লাহোর প্রস্তাবে স্পষ্টভাবে সুপারিশ করা হয়েছিল ত্রিজাতি গঠনের লক্ষ্যে। শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৭১ পর্যন্ত হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এই ত্রিরাষ্ট্র বা ত্রিজাতির জন্ম হলো কিন্তু ভৌগোলিক অখন্ডতা বিসর্জন দিয়ে তা করতে হলো। অর্থাৎ "পূর্ববঙ্গ" প্রদেশটি কিছুদিন পর "পূর্ব পাকিস্তান" নাম নিয়ে (দুই ইউনিট তত্ত্বের ফলে) পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হলো। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ১৯৪০ সালের মূল ত্রিজাতিতত্ত্বের সাথে (৩০ বছর পরের) ১৯৭০ এর ত্রিজাতিতত্ত্বের পার্থক্য কি ? হ্যাঁ পার্থক্য আদৌ করি। বিরাট পার্থক্য। তখনকার ত্রিজাতিতত্ত্ব ৬ বছর পর ১৯৪৬ সনে দিল্লী প্রস্তাব দ্বারা পরিবর্তন করা না হলে পূর্বাঞ্চলে সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রের জন্ম হতো। যুক্তবাংলা ও আসাম মিলে এক বিরাট সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ও জাতি – অর্থাৎ এক মহান রাষ্ট্র ও মহাজাতি তৈরী হতো – বাঙ্গালীরা হতো সারাবিশ্বের ২য় বৃহত্তম জাতি– যে জাতির ভাষা হতো সারাবিশ্বের ৩য় বৃহত্তম কথিত ভাষা। এই বড় হওয়া থেকে আমাদের বঞ্চিত করলো কে বা কারা ? অনেকখানি মিঃ জিন্নাহ এবং তার দোসর সোহরাওয়ার্দী ! দিল্লী প্রস্তাব না হলে হিন্দু মহাসভা হতো না আর হিন্দু মহাসভা না হলে বাংলা ভাগ হতো না অর্থাৎ স্বাধীন সার্বভৌম অখন্ড বাংলার ধ্যান ধারণার সঙ্গে যা মোটেই সংগতিশীল ছিল না সেই দিল্লী প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর হিন্দু বাঙালী এম, এল, এ,রা যুক্তবাংলা গঠনের সকল আশা ভরসা ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং বঙ্গবিভাগের পক্ষে ভোট দেয়। অর্থাৎ লাহোর প্রস্তাবের পরিবর্তনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ফলে বাঙালী হিন্দুদের মতের ও তাৎক্ষণিক পরিবর্তন ঘটে লাহোর প্রস্তাব এর পরিবর্তন বা সংশোধন না হলে বাঙালী হিন্দুরা অখন্ড বাংলার পক্ষে রায় দিতো – এত কোন সন্দেহ নেই। বাঙালীরা ধর্মীয় উন্মাদনায় পূর্ববাংলায় সৃষ্টি করলো "পাকিস্তান" আর পশ্চিমবাংলায় সৃষ্টি করলো "হিন্দুস্তান"–অখন্ড বাংলা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হলো। কিন্তু সকল বাঙালী এক হয়ে "বাঙালিস্তান" না বানিয়ে, স্বদেশের ভূমিতে পূর্ণাঙ্গ বাংলাদেশ না বানিয়ে পশ্চিম অঞ্চলকে হিন্দুস্তান আর পূর্ব অঞ্চলকে পাকিস্তান বানানোর দ্বারা বাঙালীদের কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে তা আজও আমার বোধগোম্য নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষ নামক বিশাল ভূখন্ডের জন্য ত্রিজাতিতত্ত্বই সত্য – দিজাতিতত্ত্ব নয়। তবে মহাসত্য হলো বহুজাতিতত্ত্ব। মহাতমসার তিমির বলয় ভেদ করে মহান বাংলার দীপশিখা জ্বলে উঠবে একদিন। সেটাই হবে বাঙালীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম সাধনা। হাজার বছরের তপস্যার ফল হবে মহান সোনার বাংলা – পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি এবং তৃতীয় বৃহত্তম ভাষার অধিকারী হবে যে দেশ – স্বপ্ন দিয়ে তৈরী আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি। আজ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছে গোটা কলিকাতা তথা গোটা পশ্চিমবাংলা আর ত্রিপুরা। আসামে একটা জাগরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ঘুমন্ত পশ্চিমবাংলাকে জাগাতে হবে। ঐ সোনার কাঠির নির্মাতা আজকের বাংলাদেশ যার সোনালী স্পর্শে জেগে উঠবে বন্দী বাংলার সমগ্র ভুবন।

কোন অস্ত্র শক্তি আর অর্থশক্তির প্রয়োজন হবে না – প্রয়োজন শুধু দেশপ্রেম আর শান্তির বাণী। "শান্তিপূর্ণ বঙ্গবাদ" হবে আমাদের একমাত্র অস্ত্র। শান্তি হতে পারে সবচেয়ে

শক্তিশালী কামান যদি তার গোলাবারুদ হয় একটি সত্যনিষ্ঠ মতবাদ।

শান্তিপূর্ণ ও সত্যপূর্ণ মতবাদ যখন দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পরে তখন তার জন্য কোন পাসপোর্ট ভিসা লাগে না। সত্যিকার আদর্শমন্ডিত মতবাদ রাষ্ট্র, জাতি, ধর্ম ও বর্ণের সীমানাকে অতিক্রম করতে পারে অতি সহজে । তার জন্য পথ, পাথেয় বা বাহনের কোন প্রয়োজন নেই – তার রক্ষার জন্য কোন সামরিক প্রহরার প্রয়োজন নেই আইডিয়া বা মতবাদ এর জন্মভূমি ও লালনভূমি হবে মানুষের আত্মায়। সোহরাওয়ার্দী বলেছিলেন – "বাংলাকে একটি মহানদেশ এবং বাঙালীদের একটি মহান জাতিতে পরিণত করতে হবে।" মানুষের অন্তরকে যে মহাশক্তি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। তাঁর আদেশ ছাড়া কোন মানবাত্মা কোন নতুন আদর্শ বা মানবকল্যাণমূখী. মতবাদের জন্ম দিতে পারে না। বঙ্গবাদের জন্ম এভাবেই হচ্ছে। বঙ্গবাদের ব্যাপ্তির মধ্যে পড়বে বিহার ও উড়িষ্যার বাংলাভাষী অঞ্চলসমূহ বাংলা, ত্রিপুরা, আসাম, আরাকান, নিয়ে এক বিরাট বাংলাভাষী ভূখন্ড। যারা সর্ব বঙ্গবাদের অনুসারী হবেন তাদেরকে বিশুদ্ধ বঙ্গ সংস্কৃতি লালন করতে হবে শয়নে–স্বপনে, আহারে বিহারে, মিলনে বিরহে, ভোগে ও ত্যাগে, শান্তি ও সংগ্রামে সর্বত্র। আচারে, বিচারে, প্রচারে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, চিত্রাংকনে ভূষণে ও ব্যসনে সকল ক্ষেত্রে "সর্ববঙ্গবাদ" হবে তাদের চালিকাশক্তি। বাঙালীর অস্তিত্বের কেন্দ্র বিন্দু হবে এই সর্ববঙ্গবাদ। সত্য যতই কঠিন ও দুঃসাধ্য বলে মনে হোক না কেন তাকে বরণ করতেই হবে কারণ সত্য কখনও মানুষকে বঞ্চনা করে না। মানুষ যদি প্রতাড়িত হয় তবে সে মিথ্যার দ্বারা –সত্যের দ্বারা নয়। এজন্য কবি বলেছেন "সত্য যে কঠিন, তাই কঠিনেরে ভালবাসিলাম, সে কখনও করে না বঞ্চনা।" বাঙালীর জন্য মহাসত্য হলো "সর্ববঙ্গবাদ" যা অত্যন্ত কঠিন কিন্তু কবির উপদেশ অনুসারে এই কঠিনেরে ভালবাসতে হবে – কারণ সে কখনও বঞ্চনা করবে না, সে কখনও ফাঁকি দিবে না। কারণ ফাঁকি দেওয়া মিথ্যার ধর্ম, সত্যের নয়। যে প্রেম মানুষ এর জীবনকে দেয় ঐশ্বর্য আর মৃত্যুকে জয় করতে শিখায় সেই প্রেমই সর্ববঙ্গবাদ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। কারণ প্রেম শান্তির জন্ম দেয় আর শান্তি জন্ম দেয় শক্তির – যে শক্তির প্রভাবে সমগ্র বঙ্গবলয় বাঙালীর প্রভাবে আসবে। কোন হিংসা, সংঘাত, সন্ত্রাস বা গায়ের জোরে সর্ববঙ্গবাদের প্রতিষ্ঠা হবে না। কারণ সত্যের প্রতিষ্ঠা নারকীয় শক্তির দ্বারা হয় না। – স্বর্গীয় শান্তিই সেই আত্মিক শক্তির জন্ম দেয় যা সত্যের প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত করে। বাঙালীর ব্রত হবে বঙ্গবাদ তথা সর্ববঙ্গবাদ। "দুঃখ সহার তপস্যাতেই হোক বাঙালীর জয়, ভয়কে যারা এড়িয়ে চলে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।" এতোক্ষণ ইতিহাস বিশ্লেষণ করে যে সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাহলো "লাহোর প্রস্তাবের" বিকৃতিই বাংলার অবয়বে বিকৃতি ঘটিয়েছে। লাহোর প্রস্তাবের বিকৃতি ঘটানো হয়েছে দিল্লী প্রস্তাবের দ্বারা – যার উত্থাপক ছিলেন সোহরাওয়ার্দী। কাজেই বাংলাবিভাগের জন্য যারা দায়ী, তাদের মধ্যে তিনিও অন্যতম।

লাহোর প্রস্তাব বাঙালীর সৌভাগ্যের সূচনা করেছিল কিন্তু দিল্লী প্রস্তাব বাঙালীর দূর্ভাগ্যের সূচনা করে – অর্থাৎ ফজলুল হক তার লাহোর প্রস্তাবের দ্বারা ভারতবর্ষের

পশ্চিমাঞ্চলে একটি আর পূর্বাঞ্চলে আরেকটি বিশালাকার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিলেন, যে দুই রাষ্ট্র হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম অর্থাৎ পূর্বাঞ্চল পশ্চিম অঞ্চলের অধীন থাকবে না – বাংলা আসাম মিলিয়ে সেটা হতো হিন্দু-মুসলমান মিলিত মহান বাংলা যেখানে মুসলমানরা সংখ্যায় সামান্য বেশি হলেও ধনে জ্ঞানে শিক্ষায় হিন্দুরা অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ছিল – কাজেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ব্যালেন্স আসতো। অর্থাৎ মুসলমান যখন সংখ্যাশক্তির ক্ষেত্রে বা জনশক্তির ক্ষেত্রে সামান্য এগিয়ে ছিল তখন হিন্দুরা মেধা শক্তির ক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে ছিল মুসলমানদের তুলনায়। কাজেই এক সম্প্রদায়ের উপর আরেক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বিস্তারের আশংকা ছিল না।

পক্ষান্তরে জিন্নাহর নির্দেশে সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক উত্থাপিত দিল্লী প্রস্তাবে ভারতবর্ষের দুই প্রান্তে দুই রাষ্ট্রের পরিবর্তে একটি মাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় অখন্ড স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের সম্ভাবনা তখনকার মত ধূলিসাৎ হয়ে যায়। করাচীতে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রসহ ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্ত ও পূর্ব প্রান্ত মিলিয়ে এক হাজার মাইলের ব্যবধানকে অস্বীকার করে যে অবাস্তব মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামী প্রজাতন্ত্র (পাকিস্তান নাম নিয়ে) জন্ম নিল তার সাথে ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তের মুসলিম প্রধান অঞ্চলটি শুধুমাত্র পাকিস্তানের একটি প্রদেশ রূপে যুক্ত হয়ে থাকলো – না হলো রাষ্ট্র না হলো স্বায়ত্ত শাসিত, যার নাম হলো প্রথমে পূর্ববঙ্গ, পরে পূর্ব পাকিস্তান। তার মানচিত্রকে অখন্ড বাংলার ব্যাঙ্গ চিত্র বলা যায়। দিল্লী প্রস্তাবের ফলে বাংলার হিন্দু এম, এল, এ',রা যখন দেখলো ভারতের পূর্বাঞ্চল কোন আলাদা রাষ্ট্র হচ্ছে না বরং পাকিস্তানের লেজুড় রূপে একটি উপরাষ্ট্র তৈরী হচ্ছে তখন তারা সেই উপরাষ্ট্রের মধ্যে গিয়ে অর্ন্তভূক্ত হওয়ার পরিবর্তে বাংলা বিভাগের পক্ষে ভোট দেয় –অর্থাৎ পূর্ববাংলায় বাংলা রাষ্ট্র না হয়ে পাকিস্তান কায়েম হতে দেখে তারাও পশ্চিম বাংলায় বাংলা রাষ্ট্র না বানিয়ে সেখানে হিন্দুস্তান কায়েম করে। তা না হলে আমরা পেতাম অবিভক্ত বাংলা বা হতো স্বাধীন, সার্বভৌম, স্বায়ত্তশাসিত এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি (আসাম অঞ্চলসহ) এবং তার ভাষা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তমভাষা হতো। অবশ্য ভাষা এখনও তাই এবং জাতির আকারও দ্বিতীয় বৃহত্তম, কিন্তু তার ভৌগোলিক সীমানার এক বিরাট অংশ হিন্দুস্তান ও ব্রহ্মদেশে পড়ে গেছে। উপরের চিত্র থেকে বুঝা যায় সমগ্র বাংলার কত বড় ক্ষতি করেছে দিল্লী প্রস্তাব – যার জনক ছিলেন জিন্নাহ এবং সহজনক ছিলেন সোহরঅওয়ার্দী। এটা কোন রাজনৈতিক ভূল বা দুর্ঘটনা নয়। এটা এমন একটি ইচ্ছাকৃত চক্রান্ত – যার ফলে বাঙালীকে আলাদা রাষ্ট্র গঠন করা থেকে বঞ্চিত করা সম্ভব হয়েছিল। যেভাবে ঠান্ডা মাথায়, সচেতনভাবে এবং সতর্কতার সঙ্গে লাহোর প্রস্তাবের "স্টেট্স" কথাটিকে সংশোধন করে "স্টেট" করা হলো তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শেরে বাংলার বাঙালী জাতীয়তাবাদকে কবর দেয়া হয়েছে তথাকথিত পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ দ্বারা। লাহোর প্রস্তাবের ফলে তিন রাষ্ট্র হতো – তিন জাতীয়তাবাদ হতো – পাকিস্তানী এবং বাঙালী তিন জাতিই তৈরী হতো কিন্তু দিল্লী প্রস্তাবের ফলে বাংলা রাষ্ট্র ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ খতম

হয়ে গেল । যেমন করে হিন্দুস্তানী জাতীয়তাবাদ আসাম রাজ্যকে ৭ টুকরা করে ফেলেছে। এ বিষয়টি বাংলার সাধারণ মানুষকে বুঝাতে হবে। ইতিহাসের সঠিক মূল্যায়ন বলে দেবে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সোহরঅওয়ার্দীকে আমরা যে আসনে বসিয়েছি সে আসন কি তার প্রাপ্য ? শেরে বাংলাকে বাংলার রাজনীতি থেকে, বাংলার ক্ষমতা থেকে নির্বাসন দেওয়া মিঃ জিন্নাহর লক্ষ্য হতে পারে কিন্তু পশ্চিমবাংলার সন্তান সোহরাওয়ারর্দী কেন জিন্নাহর হাতের পুতুল হয়ে একটি মাত্র রাষ্ট্র গঠন করার উদ্যোগ নিলেন (মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে) যেখানে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করার সুযোগ ছিল লাহোর প্রস্তাবে ? ১৯৪৭ সনে যদি ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম প্রধান বাংলা-আসাম অঞ্চলগুলো নিয়ে "পাকিস্তান রাষ্ট্র" গঠিত হতো তাহলে ১৯৪৭ এর পার্টিশনের ২৪ বছর পর লক্ষ লোকের জীবন বিসর্জন দিয়ে ১৯৭১ এ পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে বাংলাদেশ নামক আর একটি রাষ্ট্র গঠন করতে হতো না। ১৯৪৭ সনেই শান্তিপূর্ণভাবে আলাদা হয়েই জন্ম নিতে পারতো এবং তখনকার বাংলাদেশ খন্ডিত হতো না – তা হতো অবিভক্ত অখন্ড বাংলাদেশ। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ আসাম তার মধ্যে অর্ন্তভুক্ত থাকতো। যা ১৯৭১ এ ঘটলো রক্তপাতের মধ্যদিয়ে তা ১৯৪৭ এই ঘটতে পারতো বিনা রক্তপাতে এবং আমরা পেতাম পূর্ণাঙ্গ বাংলাদেশ। অগণতান্ত্রিকভাবে দিল্লী প্রস্তাব বাঙালীর উপর চাপিয়ে দেয়ার কারণে আমরা হারিয়েছি পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা, আসাম – যা বর্তমানে হিন্দুস্তানের অধীন। জিন্নাহ – সোহরওয়ার্দী – খাজা নাজিম – লিয়াকত চক্র ওটা হতে দিল না। সোহরাওয়ার্দীর বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কোন অভাব ছিল না – অভাব ছিল নিয়তের। তিনি অখন্ড বাংলা চাইতেন কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে নয় – পাকিস্তানের অংশ হিসেবে – যা হিন্দু বাঙালীরা কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না – এ দূরদর্শিতা তার থাকা উচিত ছিল। তেমন অখন্ড বাংলা মিঃ জিন্নাহও চাইতেন। মিঃ জিন্নাহ এবং সোহরাওয়ার্দীর তুলনায় শেরে বাংলার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই চোখে পড়বে লাহোর প্রস্তাবের রচনার মধ্যে । শেরে বাংলা অখন্ড বাংলা চেয়েছিলেন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে – পাকিস্তান বা হিন্দুস্তানী কাঠামোর অধীন একটি প্রদেশ হিসেবে নয়। পশ্চিমবাংলায় জন্মগ্রহণ করে, সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের অভিজাত পরিবেশে উর্দু প্রধান সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বর্ধিত ও লালিত হয়ে জনাব সোহরাওয়ার্দী ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী জাতীয়তাবাদের আন্তরিক প্রবক্তা হতে পারেননি যদিও তিনি প্রকাশ্যে অবিভক্ত বাংলার জন্য অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়ে যান। ব্যর্থ হয়েছেন কয়েকটি কারণে। সে কারণ তার নিজেরই সৃষ্টি। প্রধান কারণ হলো তার উত্থাপিত দিল্লী প্রস্তাব দ্বারা লাহোর প্রস্তাবের সংশোধন – আবুল হাশিম যার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। দ্বিতীয় কারণ হলো – বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়েও কলিকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন করা – যার ফলে সম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ দুটো কাজই তিনি করেছিলেন মুসলিম লীগ প্রধান জিন্নাহর নিদের্শে এবং এ দুটো পদক্ষেপই ছিল আত্মঘাতী – যে কোন বাঙালী নেতার জন্য। অত্যন্ত দূরদর্শী ও সুচতুর জিন্নাহ জানতেন কোন কাজের কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এ কারণে শেরে বাংলার সাথে জিন্নাহর মতোবিরোধ চরমে উঠে কিন্তু খাজা নাজিমউদ্দিন ও সোহরাওয়ার্দীর সাথে তার মতৈক্য হয়। একইভাবে নেতাজীর সাথে গান্ধীর মতবিরোধ

চরমে উঠে কিন্তু জে, এম, সেনগুপ্ত, কিরণ শংকর রায় খাজা নাজিমউদ্দীন আকরাম খাঁ বাংলার নেতা হয়েও নেতাজী ও শেরে বাংলাকে সমর্থন না দিয়ে আবাঙালী নেতা জিন্নাহও গান্ধীকে সমর্থন দেন। এটাই হলো বাংলার ইতিহাসের ট্রাজেডী।

আমি জানি, আমার এ লেখা পুনরাবৃত্তির দোষে দোষান্বিত। একই কথা বারবার বলেছি। কারণ বাংলার ইতিহাসের মত বাংলার রাজনীতিও কুয়াসাচ্ছন্ন। অনেক ঘটনা বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে অজানা রয়ে গেছে। ঘন কুয়াসার আড়ালে সূর্যের আলো ঢাকা পড়ে গেছে বলে সূর্য নেই একথা বলা যাবে না। অনেক সময় সত্য ঢাকা পড়ে গেছে মিথ্যার আড়ালে। তাই বলে সত্য নেই একথা বলা যায় না। অপ্রিয় সত্যকে স্বীকার করতে যে মানসিক ও নৈতিক বলিষ্ঠতা দরকার তা আমদের মধ্যে নেই। সাধারণ মানুষকে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের নবীন বাঙালী জনগোষ্ঠীকে বুঝাবার জন্যই একই কথা বারবার বলছি।

লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করে দিল্লী প্রস্তাব পাশ করার তীব্র প্রতিবাদ জানয়েছিলেন বাংলার আবুল হাশিম, পাঞ্জাবের মিয়া ইফতিখার উদ্দিন, সিন্ধুর জি, এম সৈয়দ এবং যুক্ত প্রদেশের মাওলানা হাসরাত মোহানী।

জিন্নাহর নির্দেশে সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবে কনডেনশনের মাধ্যমে লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করা হয় ১৯৪৬ সনের দিল্লী অধিবেশনে। তখন আমাদের রাজনীতি লাহোর থেকে শুরু করে দিল্লী পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিল – কলিকাতা বা ঢাকাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়নি। লাহোর অধিবেশন তিন জাতির জন্মের আশ্বাস দেয়। দিল্লী অধিবেশন দেয় দুই জাতির। ৩য় জাতির জন্মের মধ্যে লাহোর প্রস্তাব পুনর্জীবিত হয় আংশিকভাবে। দেশ অসম্পূর্ণ থেকে যায় – যদি তা বাঙালী জাতির যুক্ত আন্দোলন এর ফলে না হয়ে বিভক্ত বা খন্ডিত আন্দোলনের ফলে হয়। বাঙালী জাতি তাই আজ অর্ধমুক্ত (পূর্ণ মুক্ত নয়), অর্থ জাগ্রত, অর্ধ সুপ্ত। স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার মিশন একটি অসম্পূর্ণ মিশন। মুজিব ভাসানীর নেতৃত্বে অর্ধকের চেয়ে বেশি পথ পাড়ি দিয়েছি – আরো অর্ধক পথ বাকি আছে। এই মহাযাত্রার শেষ গন্তব্যস্থল হলো বাংলার প্রবেশদ্বার দ্বারভাঙ্গা ওটা ভারতের পূর্ব সীমানা আর বাংলার পশ্চিম সীমান্ত। জাগ্রত বাংলার দায়িত্ব হলো সুপ্ত বাংলাকে জাগিয়ে তোলা।

"খান্ডারী বাতাতি হ্যায় ইমারত বুলন্দ থা" অর্থাৎ ভগ্ন ভিটা দেখেই বুঝা যায় প্রাসাদ কত মজবুত ছিল।"

– মীর্জা গালিব।

উপরের উদ্ধৃতি দিয়ে বুঝায় বাংলার ধ্বংসাবেশেষ দেখে বুঝা যায়, অতীতের বঙ্গসাম্রাজ্য কত মজবুত ছিল।

অতীতে আমরা যখন সবাই মিলে ছোট হতে চেয়েছিলাম কেউ আমাদের হুজুগকে থামাতে পারেনি – এখন যদি সবাই মিলে বড় হতে চাই তবে কে আমাদেরকে থামিয়ে রাখতে পারবে ? বড় হওয়ার হুজুগতো ইতিবাচক!

আজ বাংলার ধ্বংসপ্রাপ্ত ভিটা থেকেই বুঝা যায় এককালে সোনার বাংলার ইমারাত কত মজবুত ছিল। বহিরাগত অবাঙালী বিদেশীকে পূজা করা বাঙালী মধ্যবিত্তের ব্যাধি। হিন্দু–মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রে একথা খাটে এবং খুব সম্ভবতঃ বাঙালীর দুর্ভাগ্যের অন্যতম কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি। এই দাসত্বসুলভ মনোবৃত্তি আমাদেরকে প্রভুর আসনে বসতে দেয়নি। আমাদেরকে মালিক না বানিয়ে গোলাম বানিয়েছে। আমাদেরকে মহাজন না বানিয়ে ক্ষুদ্রজনে পরিণত করে।

আধুনিক যুগে বাঙালী জাতির প্রথম রেঁনেসা বা পুর্নজাগরণ শুরু হয় ১৯৫২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে। এখন থেকে আমাদেরকে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ দৌলার মৃত্যু দিবস পালন করতে হবে। পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ বাহিনীর হাতে বাংলা বাহিনীর পরাজয়ের দিনটিকে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করতে হবে। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ এর জন্মদিনও পালন করতে হবে। মুজিবের বাংলার সাথে সাথে সিরাজের বাংলাকেও ফিরে পেতে হবে আমাদের। পূর্ণবাংলা, অবিভক্ত, অবিভাজ্য, অবিনশ্বর, অমর বাংলা চাই।

আধুনিক যুগে বাঙালী জাতির দ্বিতীয় রেঁনেসা শুরু হবে ২০০০ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে যা – হবে দ্বিতীয় এবং শেষ ভাষা আন্দোলন। পশ্চিমাবাংলা, ত্রিপুরা, আরাকান, আসাম এবং উড়িষ্যা, বিহারের জন্য। ১ম রেঁনেসার ঠিক ৫০ বছর বা অর্ধশতাব্দী পর ২য় রেঁনেসাটি শুরু হবে তখন কলকাতা, আগরতলা ইত্যাদি শহরে কোন হিন্দি সাইনবোর্ড থাকবে না : যেমন করে জার্মানী নিজেকে রক্ষা করেছিল ইহুদী পুঁজিবাদ, সংস্কৃতি ইত্যাদির হাত থেকে, যেমন করে ভিয়েতনাম, রুশ–মার্কিন উভয় চক্রান্ত থেকে বেড়িয়ে এসেছিল, যেমন করে দুই কোরিয়া মার্কিন–চীন উভয় শক্তির প্রভাব বলয় থেকে বের হয়ে পরস্পরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মহামিলনের পথ। দুই বাংলাকেও একই পথে অনুসরণ করতে হবে।

২০০০ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারীকে টার্গেট ডেট হিসাবে ধরে নিয়ে অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট হিসাবে ধরে নিয়ে ওখান থেকেই মহাযাত্রা শুরু করতে হবে। সংস্কৃতিক মুক্তি ও বিজয়ের লক্ষ্যে। কারণ বাংলাভাষা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক মুক্তিই এনে দেবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি বা স্বাধীনতা (পশ্চিমবাংলার জন্য)। তারপর ২য় পর্যায়ে মূল বাংলাদেশ ভূখন্ডের সাথে কনফেডারেশন গঠনের প্রশ্নে জনমত যাচাই করা যাবে ভোটের মাধ্যমে – সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পথে। ঐ জোটের মধ্যে ত্রিপুরা, আসাম, আরাকান সকলেই থাকতে

পারে। তার নাম হবে "বাংলা কনফেডারেশন।" বাঙালীর মুক্তি সংগ্রামের প্রথম পর্যায় শেষ হলেও দ্বিতীয় পর্যায় এখনও শুরুই হয়নি। এই দ্বিতীয় পর্যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ – যা পশ্চিমবাংলাকে ও ত্রিপুরা আসামকে মুক্ত হতে সাহায্য করবে এবং তৃতীয় পর্যায়ে পশ্চিম বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, আসাম, ইত্যাদি রাজ্য মূল বাংলাদেশের সাথে যোগ দিতে পারে একটি মিত্রদেশমালার কনফেডারেশন হিসাবে। এমন একটি রাষ্ট্রপুঞ্জ তৈরী হবে যা পরস্পর মিত্রতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। এই বাংলা কনফেডারেশন একটি শক্তিশালী স্বাধীন সার্বভৌম যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম দেবে যার নাম হবে "বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র" বা "বেঙ্গল কনফেডারেশণ"।

একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো – আমরা বাঙালী না বাংলাদেশী এসব দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে জাতিকে বিভক্ত করা মোটেই সমীচীন নয়। একজন বাঙালীকে বঙ্গদেশী, বাংলাদেশী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শব্দে আখ্যায়িত করতে কোন দোষ নেই কিন্তু গোটা জাতিকে অবশ্যই বাঙালী জাতি বলতে হবে। বাঙালীর বৃহত্তর মুক্তির শপথ নেবে নতুন প্রজন্ম। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের কবিতা দিয়ে আমার লেখা শেষ করতে চাই ঃ–

"নেহেরুর নখের আঁচড়ে – জিন্নাহর স্বজাতি গরীবের প্রতি দরদে
দাঙ্গা–কারফিউ, ব্যর্থ ও মিথ্যায়,
সাপিনীর বিষদাঁত মাটিকে কামড়াক,
বাঙালী মরেছে, মরল–মরবে
কিন্তু ভাইরে আর মরা যায় না।
এবার চাষ করো – গজাও
গজাও বিদ্রোহ রাশি রাশি।
সবাই বাঁচুক – বিদ্রোহে।

বাঙালীর নিয়তি হলো – তাকে বাঁচতে হবে বিদ্রোহের মধ্যদিয়ে – ধীরে ধীরে অকাল মৃত্যুর দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে যাওয়া কোন উদীয়মান জাতির লক্ষ্য হতে পারে না। কবি মানিক বন্দোপাধ্যায় আশা করছেন – সবাই বাঁচুক বিদ্রোহে। তাই পশ্চিমের বাঙালীকে আজ বিদ্রোহের শপথ নিতে হবে দিল্লীর বিপক্ষে – নইলে তারা মরবে॥

= সমাপ্ত =